ধর্মের উৎস সন্ধানে

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

প্রবাহ
৪৫এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
রাখাল বেরা
প্রবাহ
৪৫এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রী ব্রজগোপাল মাইতি
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
৩০, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

ধর্ম যাঁদের

অসহায় আশ্রয়

তাঁদের উদ্দেশ্যে

যেসব শিরোনাম রয়েছে—

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপস, নাকি ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তি?

স্পষ্ট কথা বলতে হবে এখনি

ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব ও বিবর্তন

ধর্মের সাংগঠনিক রূপ

হিন্দুধর্ম

ইসলাম ধর্ম

ইহুদি ধর্ম

খ্রীষ্ট ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম

জৈন ধর্ম

শিখ ধর্ম

চীনের লৌকিক ধর্ম

কনফুসিয়াসের ধর্ম

শিন্টোধর্ম

জরথুস্ত্রবাদ

শামানিজম

আদিবাসী ধর্ম

বাহাই ধর্ম

নাস্তিকতা, নিরীশ্বরবাদ ও অধার্মিকতা

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপস, নাকি ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তি ?

বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৩০ কোটি। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে, নানা ভৌগোলিক পরিবেশে ছড়িয়ে আছে এই মানুষ—নানাবিধ তাদের ভাষা, নানাবিধ তাদের আচার আচরণ, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, চেতনা ও ধর্মবিশ্বাস। তবে ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে, পরিভাষা বিভিন্ন হলেও এবং ধর্মাচরণের নানা ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও, প্রচলিত অর্থের নানা ধর্মে বিশ্বাসী সব মানুষই একটি অতিপ্রাকৃতিক সর্বশক্তিমান শক্তি তথা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এখানে আলোচনায় ধর্ম বলতে এই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত ধর্মের কথাই বোঝানো হচ্ছে, যেমন হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীস্টধর্ম, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্ম কথাটির বৃহত্তর অর্থ, যেমন মনুষ্যত্বের ধর্ম—এভাবে ধর্ম কথাটিকে এখনকার আলোচনায় আপাতত ধরা হচ্ছে না।

প্রচলিত অর্থের এই ধর্মে যতজন বিশ্বাস রাখেন তাঁদের তুলনায় মনে-প্রাণে এ-ধরনের কোন ধর্মে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না, বা তাকে কৃত্রিম বলে

মনে করেন—এমন ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্টই কম (অনুপাত প্রায় ৪:১)। ধর্মবিশ্বাসীরাই এখনো পৃথিবীতে সংখ্যাগত দিক থেকে বেশি বলীয়ান। ভাষাগত দিক থেকেও এঁরা সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন ঐতিহাসিক কারণেই। অবিশ্বাসীদের এঁরা চিহ্নিত করেন অধার্মিক, না-ধার্মিক, নাস্তিক ইত্যাদি নানাবিধ নেতিবাচক বিশেষণে। ধর্মকে যাঁরা মানুষের সত্যিকারের পরিচয় বলে মনে করেন না, সেই অবিশ্বাসীরাও নিজেদের এইভাবে পরিচিত করান; বরং বলা ভালো, উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে এইভাবে নিজেদের পরিচিত করাতে এখনো বাধ্য হন।

ধর্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরবিশ্বাস ভাষাগত দিক থেকে এই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার প্রধান কারণ—এই বিশ্বাস তথা কল্পনার সৃষ্টি আগে হয়েছে। এই বিশ্বাস যে মিথ্যা, এ যে নিছকই কল্পনা—এমন সত্য মানুষ উপলব্ধি করেছে পরে, তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। একটি শিশু যখন জন্মায় তখন সে সহজাত কিছু প্রবৃত্তি ছাড়া, বিশেষ কোন জ্ঞান বা বিশ্বাস বা কল্পনা নিয়ে জন্মায় না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চারপাশের জিনিষ দেখতে থাকে; তা থেকে শিখতে থাকে। তার চেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন তাকে নানাকিছু শেখায় ও তার মনে নানা ধরনের ধারণা, বিশ্বাস মূল্যবোধ ইত্যাদি ঢোকাতে থাকে, তেমনি তার নিজেরও কল্পনা করার ক্ষমতা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নানা কিছুর ব্যাখ্যা করতে থাকে। একটি শিশু তার চারপাশের জিনিষকে নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নিজের মত করেই ব্যাখ্যা করে। আর এই ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক কারণেই থাকে সীমাহীন অবাস্তব কিছু কল্পনা, মিথ্যা কিছু ধারণা।

মনে আছে, ছোটবেলায় গ্রামে বিরল দর্শন মোটর গাড়ি দেখে আমরা ভাবতাম গাড়ীর ভেতর প্রবল শক্তিশালী কেউ একজন বসে আছে। সে ঐ ভারী গাড়ীটাকে প্রবল বেগে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছেমত বাঁকা রাস্তায় বা সোজা রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। এবং শুধু ঐ মোটর গাড়ী নয়, একটি শিশু তার কল্পনায় নিজের অজ্ঞতা ও সার্বিক অসহায়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তার চেয়েও শক্তিশালী, রহস্যময় কোন একজনের কথা ভেবে নিজের অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করে। এটিই ক্রমশঃ পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

কিন্তু একসময় আরো বড় হলে, যদি সে মোটরগাড়ির কলা কৌশল জানতে পারে, তবে গাড়ির ভেতরে সে শুধু ইঞ্জিনের অস্তিত্বই মেনে নেয়, ও

শক্তিমান মানুষের অস্তিত্বকে মিথ্যা বলেই নিশ্চিত হয়। একইভাবে প্রকৃতির নানা রহস্যময়তার পেছনে বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা জানার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির পেছনে কোন রহস্যময় শক্তির অস্তিত্বের চেয়ে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও সত্যকেই জানতে পারে। জানতে পারে, গাড়ীর চালকও ঈশ্বরের প্রতীক নয়—তাঁর ভূমিকা মানুষের বর্তমান জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা পূরণকারীর।

এইভাবে একটি মানবশিশু তার জীবনের শুরুতে কল্পনাপ্রবণতা আর কল্পিত নানা কিছু সম্পর্কে বিশ্বাস ইত্যাদির জন্ম দেয়। এই সময় তার ভূত প্রেত, গা ছমছমে রাক্ষস খোক্কস, রহস্যময় অলৌকিক গল্প এসব খুব ভাল লাগে। যুক্তিবাদ, বাস্তব সম্মত চিন্তা ভাবনা, যুক্তি ভিত্তিক কল্পনা ও সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা, এগুলি মানুষ আয়ত্ত করে পরের দিকে—শৈশব পেরিয়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে।

আরো অনেক অনেক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মানব-সভ্যতা সম্পর্কেও এটি সত্য। মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে 'মানুষ' যখন মানুষ হয়ে উঠতে থাকে, তখন তার মস্তিষ্কের বিকাশও ধীর গতিতে ঘটতে থাকে, চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে সে ছিল শিশুর মত অসহায়, প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল শিশুর মতই অপ্রতুল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তা করার ক্ষমতার সে অধিকারী। এই অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করতে সে আপাত যুক্তি গ্রাহ্য নানা কল্পনার জন্ম দেয়। প্রাকৃতিক নানা কিছুর পেছনে এক পরমশক্তির কল্পনা করে। এই কল্পনাই পরে ঈশ্বর তথা নানা ভাষায় নানা নামে অভিহিত হয়। কেটে যায় হাজার হাজার বছর। জ্ঞান ও পরীক্ষা-প্রমাণ লব্ধ তথ্যাদি মানুষ ক্রমশঃ আহরণ করতে থাকে। আর এর ফলে পূর্বেকার কল্পনার বহুকিছুই সে জ্ঞানের আলোয় বিচার করে। তখন মানুষ তার পূর্বেকার, ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনার ফাঁকি সম্পর্কেও সচেতন হতে থাকে।

এভাবেই 'ঈশ্বর' তথা ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে আগে—মানব সভ্যতার শৈশবলগ্নে। তাই ভাষাগত দিক থেকেও এগুলিই প্রথমে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরে মানব সভ্যতা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করতে শুরু করলে কিছু মানুষ এ সবকে কল্পনা ও মনুষ্যসৃষ্ট বলে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধিকে ভাষাগতভাবে প্রকাশ করার জন্য পূর্বেকার স্বীকৃতিকে তথা পরিচিতিকে

সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ তা বহু বছর ধরেই মানসিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই তার নেতিবাচক পরিচিতি—নাস্তিকতা বা অধার্মিকতা। তবে দুঃখের বিষয়, যারা মিথ্যা কল্পনায় আচ্ছন্ন, তারা কিন্তু 'নাস্তিক' বা 'অধার্মিক' কথাগুলিকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে গালাগালি করার প্রধান উদ্দেশ্য, জন সমক্ষে তাঁদের হতমান করা, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের নিন্দার্হ হিসেবে হাজির করা। বিপুল বিস্তারী মিথ্যার মধ্যে মুষ্টিমেয় যাঁরা সত্যকে তুলে ধরে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই এটি সত্য।

অবশ্যি ধর্মবিশ্বাস বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, আবেগ ও চেতনায় এমন গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যে, যাঁরা ধর্মের অনড় অচল অবস্থার বিরোধিতা করেন, তার ভ্রান্তির কথা আলোচনা করেন, তাঁরা আগেভাগেই বলে রাখেন: বিশেষ কোন ধর্মমতাবলম্বীদের বিন্দুমাত্র আঘাত করার কোন ইচ্ছা নেই ইত্যাদি; এবং তাঁদের বিরোধিতার প্রধান বিষয় থাকে ধর্মান্ধতা, উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় একগুঁয়েমি বা ধর্মীয় হিংস্রতা ইত্যাদি। এ ধরনের বক্তব্যের সাহায্যে এটি পরিষ্কার করা হয় যে, একপেশে-ভাবে, বিশেষ সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে শুধু বিশেষ একটি ধর্মকে হতমান করা, তথা অন্য বিশেষ একটি ধর্মকে গরীয়ান করে দেখানো তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, বরং ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি আর অযৌক্তিক একগুঁয়েমির বিরুদ্ধেই তাঁরা বক্তব্য রাখেন। একপেশেভাবে বিশেষ ধর্মের অহেতুক নিন্দাবাদ করা অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে তথা ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে গেলে ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বিন্দুমাত্র আঘাত না করে কি তা করা সম্ভব? মোটেই না। আঘাত একটা দিতেই হয়—যদিও তা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে, বাস্তব পরিস্থিতির বিচারেই করণীয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ভারতবর্ষে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের ব্যাপারটাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা ও রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্য যারা ব্যবহার করছে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য। দেশের কোটি কোটি হিন্দু বা লক্ষ লক্ষ মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে তার প্রায় কোন প্রত্যক্ষ সম্রব নেই। কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগ আছেই, যার উৎস এই সাধারণ ব্যক্তিদের মনের গভীরে থাকা গভীর ধর্মবিশ্বাস—যা এই ধরনের ধর্মভিত্তিক 'আন্দোলনের' ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং যার ফলে রাম মন্দির হচ্ছে

বহু হিন্দুই মনে মনে খুশি হবেন এবং বহু মুসলমানই ক্রুদ্ধ হবেন—অনেকে প্রকাশ্যেও তাঁদের এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো, রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের মতো অর্থহীন বিরোধে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বা প্রচার চালাতে যখন পোস্টার বা ব্যানার দেখা যায়, 'ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে যারা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে তারা দেশের শত্রু' ইত্যাদি কিংবা 'সর্বধর্ম সমন্বয়', 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' জাতীয় গালভরা কথাবার্তা, তখন এটি বোঝা দরকার যে, এ-ধরনের বক্তব্য মূল সমস্যার বিরুদ্ধে নিতান্তই আংশিক—এবং হয়তো বা আপসপন্থী—একটি বক্তব্য। এই আপস ধর্মের সঙ্গে, বৃহত্তর জনসংখ্যার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'সর্বধর্ম সমন্বয়'—এ সব কথার মধ্যে ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার কথাই বলা হয়। নানা ধর্ম আছে থাক, মানুষ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করছে করুক, কিন্তু সব ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঐক্য হোক—এটাই যেন কাম্য; কিংবা ধর্মকে টিকিয়ে রেখেই সব ধর্মের প্রতি সম দৃষ্টিভঙ্গী করাটাই যেন কামনা। কিন্তু শত শুভ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ সব কামনা যেন 'সোনার পাথরবাটি' কামনা করার মত।

একটি নিছক কল্পনা ও মিথ্যার উপর ভিত্তি করে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে তা কমবেশি অন্ধ হতে বাধ্য। যুক্তিহীনতা ও দ্বিধাহীন আনুগত্যই এই বিশ্বাসের গোড়ার কথা। সঙ্গে মিশে থাকে গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র, ঐতিহ্য, সামাজিক অনুশাসন ও নীতিবোধ ইত্যাদি নানা দিক। সব মিলিয়ে, এ ধরনের বিশ্বাসীরা অন্য একটি গোষ্ঠীর প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হবেন বা সর্বক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে সমন্বিত হবেন—এমন আশা করা,—বাঞ্ছিত হলেও, আকাশ কুসুমের মত অসম্ভব। কিন্তু পাশাপাশি এটিও সত্য যে, বিপুল সংখ্যক মানুষের মন ও সমাজ থেকে ঈশ্বর ও ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলি এখনি রাতারাতি দূর করা দুরূহ। ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ধর্মের উপরে মানসিক ভাবে নির্ভর করার প্রবণতা দূর করাটাই আসল প্রয়োজন।

এর অর্থ এ নয় যে ধর্মীয় বিভেদই মানুষে মানুষে বিভেদের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ। প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য। কিন্তু সাধারণভাবে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষই এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের

চেয়ে ধর্মীয় বৈষম্য সম্পর্কেই বেশি সচেতন। এর ফলে বিভেদ ও বৈষম্য ক্রমশঃ বেড়েই চলে—একদিকে ধর্ম-সম্পর্কে মিথ্যা বিশ্বাস ও অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে অসচেতনতা এই বেড়ে চলার জন্য প্রধানত দায়ী। এটি বোঝা দরকার যে ধর্মীয় বিভেদ কিছু কল্পনা ও মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পেছনে রয়েছে বাস্তব সামাজিক কারণ। পৃথিবীর সবাই যদি এ দিকটি সম্পর্কে প্রকৃতই সচেতন হন, তবে ধর্মের মত একটি কৃত্রিম বায়বীয় ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সময়, শ্রম ও উদ্যম নষ্ট করা এবং পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ার মত ব্যাপারগুলিকে বালখিল্য-সুলভ কাজ বলে পরিহার করতে সমর্থ হবেন। সময়, শ্রম ও উদ্যম ব্যয় করতে পারবেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও দুরবস্থাকে দূর করার জন্য; অবশ্যি এই বৈষম্য থাকার কারণে মানুষের শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও লড়াই থাকবেই—ধর্মীয় বিভেদ যদি না-ও থাকে তাহলেও। কিন্তু ধর্ম যুদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেতিবাচক ছাড়া ইতিবাচক কোন ভূমিকা নেই; পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংগ্রাম মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উত্তরণ ঘটাতেই সাহায্য করবে।

তাই ধর্মের প্রকৃত চরিত্র, ধর্মের সৃষ্টির পেছনকার প্রকৃত সত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা দরকার—যা সচেতন ব্যক্তিদের আরো আগে, আরো গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিকভাবে করার প্রয়োজন ছিল। তা না হওয়ার ফলে বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি, সতীদাহ, ধর্মকেন্দ্রিক দাঙ্গা কিংবা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশে চার্চ, ইসকনের মাধ্যমে কৃষ্ণ-চেতনা, বা ধর্মীয় পশ্চাদপসরণ কিংবা পৃথিবীর অন্যত্র আয়াতোল্লাতন্ত্রের মত নানা মৌলবাদী চিন্তার জন্ম হয়েছে ও হচ্ছে। আপাত ও সাময়িক জনসমর্থন হারানোর ভয়ে কিংবা ধর্মকে গণসংযোগের একটি উপায় হিসেবে ভেবে, যে সচেতন ব্যক্তিরা (এঁদের মধ্যে আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও আছেন) সুযোগ থাকলেও তা করেন নি, পরে তাঁদের তার মাশুল দিতে হচ্ছে, হবেও। এখানে এ-বিষয়ে প্রাথমিক কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে, তবে এ আলোচনা আরো পূর্ণাঙ্গ, আরো যথার্থ করে তোলা দরকার—আরো অনেকের অংশগ্রহণে।

স্পষ্ট কথা বলতে হবে—এখনি

ধর্ম নামক সংবেদনশীল এই প্রক্রিয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, ধর্ম মানুষকে অনেক কিছু দেয় ও দিয়ে এসেছে—যে কারণে বহু শত বছর ধরে গরিষ্ঠতর মানুষের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস টিকে আছে, যদিও ধর্ম থেকে সাধারণ মানুষের এই পাওনার ব্যাপারটা একটা মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, পরবর্তীকালে এই পাওনাটা ফাঁকি আর প্রতারণার পর্যায়েই পৌঁচেছে।

তবু আপাতভাবে কিছু পাওয়ার সান্ত্বনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখে। কল্পিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, দেবদেবী ইত্যাদিকে পুজা প্রার্থনা নামাজ ইত্যাদির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারলে অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা পাওয়া যাবে—এ ধরনের বিশ্বাস সমস্যা-সঙ্কুল জীবনে সংগ্রাম করার জন্য মানুষকে মানসিক সাহস যোগায়। এ-সাহস নিছকই মানসিক বা মনে হওয়ার ব্যাপার হলেও ধনী-নির্ধন সব মানুষের ক্ষেত্রেই এর বিরাট ব্যবহারিক গুরুত্ব হয়েছে। ধর্মাচরণ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে মহান পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করলে, নিজের জীবনের অনেক অপ্রাপ্তি, অনেক হতাশা ও বঞ্চনার যন্ত্রণা ভুলে যাওয়া যায়। অন্যদিকে অন্য মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি অন্যায় ও প্রবঞ্চনা করেও, কেউ ধর্ম নামক কায়াহীন, মায়াময় প্রতিষ্ঠানকে সন্তুষ্ট করে আত্মগ্লানি দূর করে। কোটি-পতি চোরাকারবারি ধুমধাম সহকারে পুজা-যজ্ঞ করে বা মন্দির গড়ে দেয় কিম্বা ধর্ষণকারী ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনা করে ভাবে নিজের 'পাপস্খালন' হয়ে গেল। দাসদের (শূদ্রদের!) নিপীড়ন করা তো হিন্দু-ধর্মের স্বীকৃতিই পেয়েছে। কাফের হত্যার নাম করে ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী-দের হত্যাও ধর্মানুমোদিত!

পাশাপাশি, সমাজে বঞ্চিত মানুষেরা অভিযোগ জানানোর বা অত্যাচারের প্রতিকার করার মতো কাউকে বাস্তবে না পেয়ে ঈশ্বর ও 'তার অনুমোদিত' প্রতিষ্ঠান, ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মানসিক সাহস ও সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। এই সাহস ও সান্ত্বনা বাস্তবে ভিত্তিহীন হলেও শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইভাবে প্রতারক অত্যাচারী, অন্যায়কারীদের নিজের হাতে শাস্তি না দিতে পেরে, ধর্মানুমোদিত

ও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত ঈশ্বরের আদালত, নরকবাস, চরম বিচার ইত্যাদিতে তারা শাস্তি পাবে ভেবে মানসিক জ্বালা ও ক্ষোভকে প্রশমিত করে শান্তি লাভ করা যায়। কোনরকমে দিনাতিপাত করে বেঁচে থাকতে হলেও এই শান্তির ও ক্ষোভপ্রশমনের উপযোগিতা আছে।

কিন্তু এই উপযোগিতা সত্ত্বেও কখনোই তা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ এ ধরনের মিথ্যা আশ্বাসের ফলেই বঞ্চিত গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষেরা তাদের প্রকৃত শত্রুকে চিহ্নিত করে নির্মূল করার উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে, প্রকৃত শত্রুকে চেনার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি থেকে যায়; দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশা অকালমৃত্যু —সবই পূর্বজন্মের কর্মফল, ভাগ্যলিপি, ঈশ্বরের ইচ্ছা ইত্যাদি ধর্মানুমোদিত অপতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়। ধর্মবিশ্বাস মানুষের ব্যবহারিক, মানসিক ও আবেগগত কিছু প্রয়োজন মেটালেও, তার সামগ্রিক ক্ষতি অনেক বেশি।

গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সাপের কামড়ের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পান না, তাই যতদিন না এ-ধরনের বিকল্প তাঁদের দেওয়া যাচ্ছে ততদিন ওঝা-গুনিনের উপর তাঁদের নির্ভরতা দূর করা উচিত নয়, কারণ তা হলে তাঁরা ওঝা-গুনিনের কাছ থেকে যতটুকু মানসিক সাহস পাচ্ছিলেন তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এর ফলে নির্বিষ সাপের কামড়েও চরম আতঙ্কিত ব্যক্তি এই সাহসের অভাবেই মারা পড়তে পারেন—এধরনের একটি যুক্তি অনেকে দেখান। কিন্তু এটি একটি অপযুক্তি। একইভাবে এটিও অপযুক্তি যে, ধর্ম বিপুল সংখ্যক মানুষকে যে গোষ্ঠীবদ্ধতা, যে মূল্যবোধ, যে মানসিক ও সামাজিক আশ্বাস দেয়, তার বিকল্প না দেওয়া অব্দি ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মোহ দূর করা উচিত নয়, কারণ তা হলে মূল্যবোধহীনতা ও মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে। সাপের প্রসঙ্গে তা অপযুক্তি—কারণ, এখন বিশেষত যখন সর্প দংশনের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার কথা জানা গেছে, আজো বঞ্চিত মানুষকে তা না জানানোর অর্থ, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পাওয়ার জন্য তাঁদের সচেতন প্রয়াস গড়ে তুলতে সহযোগিতা না করা, গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়া, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা, জরুরি প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা ইত্যাদির জন্য তাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে সহযোগিতা না করা। একইভাবে, ধর্ম প্রসঙ্গে তার উৎপত্তির ইতিহাস জানা গেছে, ধর্মকে কিভাবে শাসকশ্রেণী শাসন-শোষণের

স্বার্থে ব্যবহার করে ও শাসিত-শোষিত মানুষ কিভাবে ধর্মে মিথ্যা আশ্রয় খোঁজার কাজে তাকে ব্যবহার করে—এসব জানা গেছে। আর তাই পাছে এখনো কেউ ক্রুদ্ধ হবে, কারো বিশ্বাসে আঘাত করা হবে, এসব ভেবে ধর্ম প্রসঙ্গে সত্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষকে না জানানোর অর্থ যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ব্যাপক জনগণকে সচেতন না করা, ধর্মকে কেন্দ্র করে শাসককুলের ষড়যন্ত্র ও নিপীড়িত মানুষের আত্মবঞ্চনার যন্ত্রণা দূর করতে সংগঠিত না করা। ধর্মের বিকল্প যথার্থভাবে না পাওয়া অব্দি এবং যে সামাজিক অবস্থার কারণে ধর্মের নানা ধরনের ব্যবহার টিকে আছে সে-অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া অব্দি ধর্মচেতনার অবশেষ, উপযোগিতা ও ধর্মের ব্যবহার টিকে থাকবে—এটি আংশিক হলেও সত্য। কিন্তু এটি আরো সত্য যে, নিজের পাযে দাঁড়িয়ে এই বিকল্প ও পরিবর্তিত অবস্থা গড়ে তোলার জন্য ধর্ম সম্পর্কে মোহ, তার উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, শাসন-স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে অসচেতনতা—এগুলিও গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের মন থেকে দূর করা দরকার।

ধর্ম শোষিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, সমাজের প্রতিকূল শক্তিসমূহ ধর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস আফিমের মতো কাজ করে—ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা সত্য হলেও, এটিও সত্য যে, ধর্মীয় অনুশাসন এক সময় সংবিধানের কাজ করেছে; পৃথিবীর দু-একটি দেশে প্রত্যক্ষ ভাবে এখনো তা করছে, যেমন নেপালে হিন্দু ধর্ম, আরব দেশগুলিতে ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর থেকেই রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন তথা সংবিধান সর্বদাই শাসক শ্রেণীর শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তৈরি করা। অতীতে এক সময় বহু রাষ্ট্রে ধর্ম আর ধর্মীয় অনুশাসন ছিল এই সংবিধানের মূল ভিত্তি। বর্তমানে কয়েকটি ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে ধর্ম তার এই ভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে নেই। কিন্তু পরোক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালীভাবেই রয়েছে। তার এই প্রচ্ছন্ন প্রভাব দূর না হওয়ার কারণে কিছু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও কিছু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশেও তার শক্তিশালী পুনরাবির্ভাব ঘটেছে—যার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রয়েছে মানুষের ব্যাপক হতাশা ও অনিশ্চয়তা, সমাজের প্রতিকূল শক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, বঞ্চনা ও বিশ্বাসভঙ্গ।

এই পশ্চাদপসরণ দূর করার জন্যও ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত সত্য দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জানানো

দরকার। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও অপব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাবলী জানা ও জানানোর চেষ্টা করা দরকার আপামর জনসাধারণকে।

ধর্ম যে মানুষেরই প্রয়োজনে মানুষেরই তৈরী, ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদ যে নির্ভেজাল কৃত্রিম একটি ব্যবস্থা—এ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা দরকার। ধর্ম না থাকা মানে খুব খারাপ কিছু বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস মানে খুব নিন্দার্হ একটি ব্যাপার—এ সবও মনে করার কারণ নেই। বর্তমানে পৃথিবীর ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ কোন ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ তাঁরা অধার্মিক বা নাস্তিক। তাঁরাও অন্য ধার্মিক, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মতই বেঁচে আছেন। তাঁদের জীবনেও অন্যদের মতই সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা, সমাজের প্রতিকূল শক্তি সমূহের প্রতিফলন ইত্যাদি সবকিছুই আছে। কিন্তু তার জন্য তাঁদের ঈশ্বর বিশ্বাসে আশ্রয় নেওয়ার বা ধর্মীয় আফিমের নিষ্ক্রিয় নেশায় আচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ধর্ম মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় আদৌ নয়। তবে প্রয়োজন হল প্রাসঙ্গিক মানবিক মূল্যবোধ ও যুগোপযোগী নৈতিকতা তৈরী করা ও অনুসরণ করা।

পূর্বোক্ত ঐ ১০০ কোটিরও বেশি ধর্মহীন ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষ সমাজে একঘরে, অসম্মানিত, প্রেমহীন, আবেগহীন, যন্ত্রবৎ মোটেই নন। তাঁদের কাছে ঈশ্বরকে ভালবাসা ও সম্মান করার পরিবর্তে মানুষকে ভালবাসা ও সম্মান করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কাছে ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করার চেয়ে মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে রক্ষা করাটাই মুখ্য। অন্যদেরও এ সম্পর্কে সচেতন করা এখন অন্যতম জরুরী কাজ।

দুঃখের বিষয়, এখনো তা তো হয়ই নি, বরং সম্পূর্ণ উল্টো কাজই হচ্ছে—এটিও ধর্মকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশলেরই অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম বিশ্বাস : উদ্ভব ও বিবর্তন

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলি সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম, খ্রীস্ট ইত্যাদি কোন ধর্মই চিরন্তন বা সনাতন (eternal অর্থে) নয় ; সনাতন ধর্ম নিছকই একটি

ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্মসৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো বহু সহস্র বছর আগে। এখনো অব্দি পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, 'মানুষ'-এর মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল এখনকার মানুষের পূর্বসূরী নিয়ানডার্থাল মানুষের আমলে—যারা পৃথিবীতে ছিল এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে ৪০-৫০ হাজার বছর আগে (Mousterian Period—Pleistocene epoch-এর একটি অংশ)।

সৃষ্টি রহস্য—১

- এখন থেকে দেড়-দুই হাজার কোটি বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।
- পারমাণবিক কণিকা ও বিভিন্ন কণিকার মিলনে নানাবিধ পদার্থের পরমাণু-অণুর সৃষ্টি হতে থাকে।
- পরবর্তী কোটি কোটি বছর ধরে ছায়াপথ, নক্ষত্র, সূর্য-গ্রহ ইত্যাদির সৃষ্টি।
- এখন থেকে ৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিমতম শিলা (মাটি) সৃষ্টি হয়।
- ৪৬০-৫৭ কোটি বছর আগেকার সময়কে বলা হয় প্রিক্যামব্রিয়ান যুগ (Precambrian era)। এই সময়েই নানা পদার্থের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে আকস্মিকভাবে জৈব পদার্থ ও তার থেকে এককোষী প্রাণের জন্ম—এখন থেকে ৩৭০-৩০০ কোটি বছর আগে কোন এক সময়ে। এক কোষী প্রাণ সৃষ্টির ২৬ কোটি বছর পরে বহু কোষী প্রাণের জন্ম। তারও পরে কোটি কোটি বছর ধরে জটিলতর বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি। এদের অধিকাংশই স্বল্প সময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। কিছু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকে ও তাদের ক্রমবিবর্তন ঘটতে থাকে।
- ৫৭—২২.৫ কোটি বছর আগেকার সময়কে বলা হয় প্যালিওজোইক যুগ। এই সময়কালে ক্রমশঃ অমেরুদণ্ডী প্রাণী, খোলওয়ালা শামুক ইত্যাদি, মাছ, পোকা-মাকড়, প্রাথমিক উদ্ভিদ, ফার্ন—এদের সৃষ্টি।

তখন শাসক-শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিল না, শাসনস্বার্থে ধর্মের ব্যবহার হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অজ্ঞতা ও

অসহায়তার কারণে তার 'উন্নত' কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিল একটি উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসকশ্রেণীর অপব্যবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে—সেটি অনেক অনেক পরের ব্যাপার,

সৃষ্টি রহস্য—২

● ২২.৫–৬.৫ কোটি বছর আগেকার সময়কালকে বলা হয় মেসোজইক যুগ। এই সময়েই নানা সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদির সৃষ্টি। এর শেষ ৭ কোটি বছর সময়কালে (ক্রেটাসিয়াস পিরিয়ড) ডাইনোসরের উদ্ভব—কয়েক কোটি বছর ধরে পৃথিবী দাপিয়ে তাদের অবলুপ্তি। এই সময়ে পুষ্পিত উদ্ভিদেরও সৃষ্টি।

● ৬.৫ কোটি বছর আগে থেকে বর্তমান সময়কালকে বলা হয় সেনোজইক যুগ (cenozoic era)।

● ৬'৫ কোটি বছর আগে থেকে, বর্তমান সময়ের ২৫ লক্ষ বছর পূর্ববর্তী সময়কালকে বলা হয় টারসিয়ারি পিরিয়ড—এই সময়ে উল্লেখযোগ্য বিবর্তনঘটে স্তন্যপায়ী প্রাণীর। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে বাঁদর, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এদেরই একটি শাখা থেকে আদিমতম মনুষ্যেতর প্রাণীর উদ্ভব (early hominid) ২'২ থেকে ১.৮৫ কোটি বছরের মধ্যবর্তী সময়কালে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এদের থেকে সৃষ্টি হয় র‍্যামাপিথেকাস—দেড়কোটি থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে সৃষ্টি হয় অস্ট্রালোপিথেকাস—যারা বর্তমান মানুষের আদিম রূপ হিসেবে গণ্য হয়।

—বিগত ২-৩ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এখন যেমন বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে পড়ে ব্যাপক মানুষকে শোষণ ও শাসন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সে আরেক ইতিহাস।

নিয়ানডার্থাল মানুষের আগের স্তর অর্থাৎ পিথেকানথ্রোপাস (Pithecanthropus erectus) বা সিনানথ্রোপাসদের (Sinanthropus pekinensis) মধ্যে ধর্মাচরণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তখনকার

'মানুষের' মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার ক্ষমতা এতটা উন্নতও ছিল না,* যার সাহায্যে ধর্ম ও অতি-প্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নততর চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত। (এ-কারণে গরু, ছাগল, এমনকি গরিলা শিম্পাঞ্জিও ভগবানের কল্পনা কিংবা ধর্মচিন্তা করতে পারে নি।) মানুষকে তখন স্থূল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা ও জীব-জন্তুর সঙ্গে নিরন্তর

সৃষ্টি রহস্য—৩

● এখন থেকে ২৫ লক্ষ বছর আগে থেকে ১০,০০০ বছর আগের সময়কে বলা হয় প্লীস্টোসিন কাল (Pleistocene epoch) এবং ১০,০০০ বছর আগে থেকে আজ অব্দি সময় হলোসিন কাল (Holocene epoch)। এই উভয় কাল মিলে কোয়ার্টারনারি পিরিয়ড—যা সেনোজইক যুগের সর্বশেষ অংশ।

● প্লীস্টোসিন কাল-এ মনুষ্যেতর প্রাণীর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ১৫ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ বছর আগে জাভা মানুষের (পিথেকানথ্রোপাস ইরেকটাস) সৃষ্টি। এরা (Homo erectus) 'মানুষ' (Homo sapien)-এর পূর্ববর্তী রূপ।

● এখন থেকে সাড়ে ৮ লক্ষ বছর আগে—'জাভা মানুষ' থেকে 'মানুষ'-এ রূপান্তরের পর্যায়ে,—আরেক ধরনের অন্তর্বর্তী মনুষ্যেতর প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা sapiens erectus intermediate type বা Vertesszollos man নামে পরিচিত এবং বুদাপেস্টের কাছে এদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এরি কাছাকাছি সময়কালে পিকিং মানুষ (সিনানথ্রোপাস পেকিনেনসিস) ইত্যাদিদের উদ্ভব।

● এসব 'মানুষের' মধ্যে ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত কল্পনার সামান্যতম উন্মেষও ঘটে নি।

---

*পিথেকানথ্রোপাস বা জাভা মানুষদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বৃহত্তম গরিলা ও নিকৃষ্ট আধুনিক মানুষ (Cromagnon, Homo sapiens)-এর মাঝামাঝি। এরা প্রায় সোজা হয়ে হাঁটত। সিনানথ্রোপাস বা পিকিং মানুষ আরেকটু ভালোভাবে সোজা হয়ে হাঁটত, মস্তিষ্কের আয়তন ছিল আরেকটু বেশি।

সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিল। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা, মৃত্যুর পরে কি ঘটে, ইত্যাকার গবেষণা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, জীবনযাত্রা রূপান্তরিত হয়েছে, পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থালদের সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগেকার ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেন প্রাকধর্মীয় অবস্থা (Pre-religion Stage)।

এর পর উদ্ভব হলো নিয়ানডার্থাল মানুষদের, পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়ান্ডার উপত্যকায় পাওয়া গেল এই ধরনের ভিন্নতর ও উন্নততর মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল। তার আগে জিব্রাল্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বহু অঞ্চলে এ ধরনের মানুষের কঙ্কাল, কবর ও অন্যান্য নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন থেকে প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ (ক্রোম্যাগনন মানুষ বা Homo sapiens)-এর উদ্ভব। তার আগে অব্দি সুদীর্ঘকাল ধরে এই নিয়ানডার্থাল মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিকে ছিল। তারা ছিল শিকারী, থাকত গুহায় এবং পরিবার গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও, পূর্ববর্তী যে কোন 'মনুষ্যেতর মানুষের' চেয়ে বিকশিত ছিল। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য নানা কিছুর মতো, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা ও এ-ব্যাপারে চিন্তা করতে পেরেছিল বলেই মনে হয়। তাদের কবর খুঁড়ে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃতব্যক্তির কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু জিনিস কবরের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসরণ করত। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিল অভিনব ও যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার। আর এভাবেই মৃত্যুর পরবর্তী 'প্রাণ' বা প্রাণের কারণ হিসাবে 'আত্মা' জাতীয় কোন একটি কিছুর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা যে

তারা ধীরে ধীরে শুরু করেছিল তা বোঝা যায়। রহস্য উন্মোচন করা, অনুমান করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও অনুসন্ধান করার এই আদিম বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আভাস তাদের মধ্যে এভাবে পাওয়া যায়। পরিবেশ ও প্রকৃতির বিরূপ শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট ও আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক-এর প্রাথমিক উদ্ভবও এ-সময় ঘটে। জীবজন্তু কিংবা নিয়ান-ডার্থালদের আগেকার 'মানুষেরা' এটি ভাবেই নি যে, এভাবে নিজেদের করা (উদ্ভাবিত!) কোন পদ্ধতি বা অনুষ্ঠানের সাহায্যে আসন্ন শিকারের কাজ সফল করা যেতে পারে বা রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তিকে 'সন্তুষ্ট করা যেতে

সৃষ্টি রহস্য—৪

● এখন থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষ (Homo sapien neanderthalis)-এর উদ্ভব কিন্তু এই নিয়ানডার্থাল মানুষও তার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে আরো লক্ষাধিক বছর পরে। এদের বিকশিত বিবর্তিত রূপ হচ্ছে আধুনিক মানুষ বা ক্রোম্যাগনন মানুষ (Homo sapien)—এখন থেকে ৫০-২৫ হাজার বছর আগে এদের উদ্ভব।

● ক্রোম্যাগনন মানুষে পরিবর্তিত হওয়ার পর্যায়ে নিয়ানডার্থাল মানুষই আত্মা বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে ধারণার জন্ম দেয়। আদিম ধর্মানুষ্ঠানের উন্মেষও ঘটে এই সময়েই।

পারে'। শিশুকে বা কোন ব্যক্তিকে খাবার দিয়ে আদর করে সন্তুষ্ট করার বাস্তব ঘটনা হয়তো তাদের মধ্যে এ-ধরনের সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। প্রায় ৫০,০০০ হাজার বছর আগে ঐ সময়ে এখনকার অর্থে কোন ধর্ম তখন স্পষ্টতই ছিল না। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, তথাকথিত বৈদিক ধর্মের (হিন্দুধর্মের পূর্বসূরী) উদ্ভব হয়েছিল এখন থেকে মাত্র ৩,৫০০ বছর আগে (প্রায়), ইসলামধর্ম ১,৩০০ বছর আগে, বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজার বছর আগে, খৃীস্টধর্ম ২,০০০ বছর ইত্যাদি। মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫,০০০ বছর। ৭-৮ হাজার বছর ধরে সে ধাতু ব্যবহার করছে। তার আগে লক্ষ লক্ষ বছর আদিম মানব পাথরই ব্যবহার করত; তথাকথিত ধর্মচেতনাও ছিল অনুরূপভাবে আদিম। কিন্তু ধর্মের প্রাথমিক উপাদান

৪০-৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই আভাসিত হয়, আত্মা (soul), অলৌকিক শক্তি, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি ধারণারও ভিত্তি সৃষ্টি হয়।

আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর ধরে, শতশত বংশ পরম্পরায় পল্লবিত হয়েছে ঐ আদিম মানুষের মনে, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা তথা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত আত্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমাত্মার ধারণার সৃষ্টি করেছে! পরে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হলে এর নামও ভিন্ন হয়, যেমন ওসিয়ানিয়ায় 'মানা' (Mana), এশিয়ার কিয়দংশে ব্রহ্ম বা আল্লা, ইয়োরোপে গড, অস্ট্রেলিয়ায় রাতাপা (Ratapa) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্পষ্টতই এগুলি ধারণাই এবং নিয়ানডার্থাল থেকে এই স্তরে আসার আগে আরো অনেক বিবর্তন ঘটেছে এসব ধারণার।

এমন থেকে ৪০-১৮ হাজার বছর আগে ছিল উচ্চতর পুরা-প্রস্তর যুগ (Upper Palaeolithic Period)। আধুনিক মানুষের সৃষ্টি এ-সময়ে হয়েছে। 'ধর্ম', আত্মা, পরমাত্মা, যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক সম্পর্কিত ধারণাবলীও আরো সুসংহত হয়েছে। তাদের পাথরের অস্ত্র উন্নত হয়েছে। একই সঙ্গে সফল ও নিরাপদভাবে শিকার করা, প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করা—এসব উদ্দেশ্যে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানও উন্নত হয়েছে। তাদের কবরস্থানের উপর গবেষণা করে এটি জানা গেছে যে, কারো মৃত্যুর পরে তারা কিছু কিছু আচার ও পূজা জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করত—এখনকার শ্রাদ্ধশান্তি, কোরাণ-খানি, প্রার্থনা ইত্যাদির যা ছিল আদিরূপ।

মৃত্যুর পরেও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের কুসংস্কার ছিল—যে ধারা এখনো চলছে। অতি পরিচিত প্রিয় কেউ মারা গেলে, সে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল—এ ধরনের করুণ সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে আপাত সান্ত্বনালাভের উপায়ও ছিল তা। পূর্ববর্তী সময়ে যে ধর্মবিশ্বাসের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এ-সময় তা শৈশব লাভ করে। স্পেন, ফ্রান্স ইত্যাদির গুহাগাত্রে পাওয়া তখনকার মানুষের আঁকা ছবি থেকে, সফল শিকারের জন্য তারা যে নানা অনুষ্ঠান করত তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্যময়, হয়তো বা প্রতিকূল শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'পূজো-আচ্চা'র জন্ম হয় এ-সময় (—যে ধারা এখনো তথাকথিত উন্নত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আরো জটিলভাবে রয়েছে, এবং যে-দিকটি এখনকার এ-সব মানুষের মানসিকতায়

ঐ পুরা-প্রস্তরযুগীয় অবস্থার পরিচয় বহন করে।) ঐসব ছবিতে এও দেখা গেছে যে, বিশেষ একজন পশুর মুখোশ পরে বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড করছে—যাকে যাদুকর (sorcerer) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ঐ আদিম মানুষদের কেউ কেউ যে নিজেকে ম্যাজিক জানা বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করত, অথবা বিশেষ কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতো অতি-প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কিংবা মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতার জন্য বিশেষ কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারত এবং এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করত—এটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

পরবর্তীকালের পুরোহিত, অবতার, বাবাজি, অবধূত, মোল্লা, যাজক ইত্যাদির আদিম পূর্বসূরী এরা। অর্থাৎ এ-ধারাও শুরু হয়েছিল পুরা-প্রস্তর যুগেই। এসব ছবিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল—মানুষের মুখকে অস্বাভাবিক ভয়ংকর করে দেখানো—অথচ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। অনেক গবেষকের মতে, মানুষের উপর যাতে অন্য অশুভ শক্তির বা জীবজন্তু যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে না পারে, তারজন্যই মানুষের সঠিক ছবি আঁকা হয় নি। বাস্তব থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরে গিয়ে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা এসবের মধ্যে স্পষ্ট। এটি আরো প্রকটভাবে দেখা যায়, নারীচিত্রে—যেগুলি মূলত দেখা গেছে পশ্চিম ইয়োরোপ ও রাশিয়ার পুরা-প্রস্তর যুগীয় গুহাগাত্রে। উলঙ্গ, বৃহৎ স্তনযুক্ত অতিমাত্রায় স্ফীত-উদরসহ এসব নারীর ছবি বিশ্লেষণ করে গবেষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—এগুলি প্রধানত ছিল আবাসস্থলের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে কল্পিত, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক ও যৌনতা-উর্বরতার দ্যোতক। পুরা-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে, অ্যাজিলিয়ান সময়ে* আঁকা গুহার ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল—তাতে মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। আবার জ্যামিতিক চিত্র, পাথরের একদিকের গায়ে প্রায় সমান্তরাল রহস্যময় রঙীন রেখা (প্রায়শই লাল), ডিম্বাকার চিহ্ন এবং অক্ষর জাতীয় চিহ্নাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। এসবের বিশ্লেষণ করে, এগুলি টোটেম ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনুমান করা হচ্ছে, যদিও এগুলির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এখনো করা সম্ভব হয়নি। তবে এটি অন্তত স্পষ্ট যে, বিভিন্ন পূজা-আচ্চা, আচার অনুষ্ঠান, যাদুবিদ্যা ইত্যাদির জন্যও

* পুরাপ্রস্তরযুগীয় কালকে চারভাগে ভাগ করা হয়: Aurignancian, Solutrean, Magdalenian ও Azilian।

এসব কাজে লাগানো হতো। বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী একটি মনুষ্যগোষ্ঠী নিজেদের রক্ষাকর্তা হিসেবে কোন বিশেষ জীবজন্তু বা প্রাকৃতিক জড় বস্তুকে কল্পনা করতে শুরু করেছে। এটি টোটেম চিন্তা ও এর থেকে পরে নাগবংশ, সূর্যবংশ জাতীয় কল্পনারও সৃষ্টি। পুরা-প্রস্তর যুগেই পৃথিবীর নানা অংশে এই কল্পনা প্রাথমিক ভিত্তিলাভ করে।

এই টোটেমচিন্তা (totemism) ধর্ম নয়—কিন্তু এর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদান মিশে আছে। একটি টোটেম হচ্ছে একটি বিশেষ কোন পদার্থ, যেমন হয়তো কোন বিশেষ প্রাণী বা গাছ, যা কোন মানুষ বা মনুষ্যগোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত (অবশ্যই এই সম্পর্ক কল্পিত) হিসেবে ভাবা হয় বা তাকে ঐ মানুষ বা মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়। টোটেমচিন্তা হচ্ছে এমন এক ধরনের কল্পনা যেটি ঐ বিশেষ একটি টোটেম-এর সঙ্গে কোন মানুষ বা মনুষ্যগোষ্ঠীর রহস্যময় সম্পর্ক বা আত্মীয়তার কথা বলে। মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা ও ধর্মীয় চিন্তা বিকাশের সর্বক্ষেত্রে, সর্বত্র যে টোটেমচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে একই মাত্রায় বিকশিত হয়েছে তা নয়। কোন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে কম, কারোর মধ্যে বেশি এই টোটেমচিন্তা এসেছে। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের মনোজগতে এই টোটেমচিন্তার বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়েছেই।

টোটেম ও টোটেমিজম সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা বা ব্যাখ্যা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে কিছুটা ভুল ভাবে। শব্দটির উৎস উত্তরপূর্ব আমেরিকার গ্রেট লেক অঞ্চলের, অ্যালগোনকিয়ান নামে এক আদিবাসী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ 'অটোটেমান' (ototeman)। ওজিবুওয়া-র এই আদিবাসীগোষ্ঠীরা এই শব্দটির সাহায্যে ভাইবোনের সম্পর্ককে বোঝাত এবং এর ব্যাকরণগত মূল ধাতু (root) হচ্ছে 'ওট' (ote)—যার অর্থ ভাইবোনের মধ্যকার রক্ত-সম্পর্ক, যে সম্পর্কের কারণে এদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ওজিবুওয়া-র এই আদিবাসীরা বিশেষ পশুর ছাল পরত। এক ইংরেজ ব্যবসায়ী ঐ এলাকায় গিয়ে এটি লক্ষ্য করেন এবং 'ওটোটেমান' শব্দটির ব্যবহার শুনে ভুলভাবেই তাঁর ধারণা হয় যে, এর সাহায্যে বিশেষ ব্যক্তির আত্মার কথা বলা হচ্ছে, যে আত্মা কোন একটি পশু রূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। ১৭৯১ সালে তিনি এই শব্দটি ইয়োরোপে এই অর্থে ব্যবহার করেন। অন্য সূত্র থেকে প্রায় এই সময়কালেই জানা যায় যে, ঐ আদিবাসী গোষ্ঠীর

লোকেরা নিজেদের মধ্যকার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীকে ঐ এলাকার বিভিন্ন জীবজন্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে পরিচিত করায়। সব মিলিয়ে ধারণা হয় যে পূর্বোক্ত শব্দটির সাহায্যে বিশেষ পশু ও তার সঙ্গে বিশেষ মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রতীকী সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। কিছু পরিবর্তিত হয়ে শব্দটি 'টোটেম' রূপ পায়। ভুলটা বোঝা যায় পিটার জোন্‌স্‌ নামে ওজিব্‌ওয়া এলাকারই এক পূর্বতন আদীবাসী গোষ্ঠীনেতার লেখা বই থেকে। ইনি মেথডিস্ট যাজক হয়েছিলেন এবং ১৮৫৬ সালে মারা যাওয়ার পর তাঁর বইটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি জানিয়েছেন যে, ঐ আদিবাসীগোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করতেন পরম আত্মা (the great spirit) তাঁদের টুডেম (toodaim) দান করেছেন, যার ভাবগত অর্থ হল গোষ্ঠীর সবাই পরস্পর রক্ত সম্পর্কযুক্ত এবং তাই নিজেদের মধ্যে বিবাহ তথা যৌনসম্পর্ক করা উচিত নয়। ব্যাপারটি স্পষ্টই নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন ব্যভিচার বন্ধ করার একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু ততদিনে 'টোটেম' শব্দটি ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

যাই হোক, টোটেমচিন্তার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে—

(ক) টোটেম-কে আত্মীয়, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী বন্ধু বা বংশের আদিপুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হত। তার রয়েছে অতিমানবিক ক্ষমতা ও শক্তি। তাকে শুধু শ্রদ্ধা বা সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করাই হত না, তাকে ভয়ও করা হত।

(স্পষ্টতঃ পরবর্তীকালের নানা কল্পিত দেবদেবীর পূর্বসূরী বা সমগোত্রীয় ছিল এই ধরনের টোটেমরা।)

(খ) টোটেম-কে বিশেষ নাম ও প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হত।

(গ) টোটেমের সঙ্গে নিজেদের আংশিক একাত্মতা বা প্রতীকী আত্মীকরণের দিকটি কল্পিত হয়েছে।

(ঘ) টোটেমকে হত্যা করা, খাওয়া, এমন কি স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ করা হয়; কখনো বা তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার কথাও বলা হয়।

(ব্যাপারটি হয়তো এলাকার বিশেষ জন্তু বা গাছকে রক্ষা করার তাগিদ থেকে এসেছে। তথাকথিত হিন্দুরা যেমন শুরুতে গরুর মাংস খেত বা ব্যাপকভাবে গরু বলি দিত—কিন্তু পরে অর্থনৈতিক কারণে গোসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় তাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে দেবতার মর্যাদা দিয়েছে।)

(ঙ) টোটেমকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান ও আচারবিধির সৃষ্টি।

পৃথিবীর নানা অংশে পরবর্তিকালে পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত আকারে এই টোটেমচিন্তার নানা দিক বিভিন্ন ধর্মে প্রবেশ করেছে। মুসলিমরা শুয়োর খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। অনেক ভারতীয় (তথাকথিত হিন্দু) বাঁদর বা হনুমানকে পুজো করা শুরু করেছে, কেউ বা করে সাপের পুজো; আর অধিকাংশ হিন্দুর কাছে গরুতো পূজ্য দেবতাই।

সময় কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রা বিকশিত হতে থাকে—একইসঙ্গে বিকশিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে সম্পৃক্তভাবে মিশে থাকা ধর্মচিন্তা। পরবর্তী আলোচনায় নব্যপ্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ইত্যাদি সময়ে ধর্মের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তার আগে আপাতত আরো কিছু কথা বলা দরকার। মানুষের বিকাশের বিভিন্ন সময়কাল একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা মুশকিল। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী-স্তরের মানুষ, পরবর্তী-স্তরের সঙ্গে একই সময়ে ছিল—এমনকি হাজার হাজার বছর ধরেও। পুরা-প্রস্তর যুগের সময়কেও অনেকে নব্যপ্রস্তর যুগের পূর্ববর্তী কয়েকলক্ষ বছর বলেই ধরেন। ঐ সময়ে মানুষ আগুন আবিষ্কার করে, যা তার জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে, জীবজন্তুর থেকে তার পার্থক্যকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই আগুন অবশ্যম্ভাবীভাবে তার যাদুবিদ্যা ও ধর্মচিন্তার মধ্যেও মিশে গেছে। ২৫-৩০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষ সংখ্যায় কমতে থাকে বা প্রায় লুপ্ত হয় এবং আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হয়—মস্তিষ্কের আয়তনবৃদ্ধি তথা জটিলতা ও দক্ষতা, যার অন্যতম গুণগত বৈশিষ্ট্য। আগের লক্ষ লক্ষ বছরে যা হয় নি, পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে এর ফলেই মানুষের চিন্তা, জীবন ও সংস্কৃতি বৈপ্লবিকভাবে উন্নত হতে থাকে। মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠতে থাকে। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি পাল্টাতে থাকল। জাদুবিদ্যার ব্যবহার—যা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে যুক্ত, তারও ব্যবহার, জটিলতা ইত্যাদিও উল্লম্ফনের ভঙ্গিতে বাড়তে থাকে। আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণাও অতি দ্রুত পল্লবিত হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সর্বপ্রাণবাদ (animism, animatism)-এর।

আদিম মানুষের ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে কয়েকটি দিক অত্যন্ত স্পষ্ট:

এক, ধর্মীয় চিন্তা আদিম মানুষকে কেউ দেয় নি, আদিম মানুষই তার ক্রমবিকাশমান মস্তিষ্কের বলে একসময় এ-ধরনের চিন্তার সৃষ্টি করতে পেরেছে;

দুই, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয়, ঈশ্বরই মানুষের কল্পনার সন্তান;

তিন, মানুষ তার নিজের বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে (অন্তত সে যাকে মনে করেছে 'প্রয়োজন মেটানো') যাদুবিদ্যা, আত্মা, মৃত্যু পরবর্তী প্রাণ, ইত্যাদি ধারণার 'উদ্ভাবন' করেছে, তথা ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে ;

(পরবর্তীকালে এগুলি আরও সুসংহত রূপও পেয়েছে এবং এখনকার বিশেষ নামের বিভিন্ন ধর্মেরও চেহারা নেয় ; কিন্তু সে পরবর্তী আলোচনার বিষয় ;

চার, প্রাণের পেছনে 'আত্মা'-র ভূমিকা নেই। আত্মা বহু সহস্র বছর আগেকার মানুষের কল্পনাই। তখন বৈজ্ঞানিক উন্নত কোন পদ্ধতিও ছিল না, যার সাহায্যে কল্পনা ছাড়া প্রাণের রহস্য সমাধানে যথার্থ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত।

ধর্ম চিন্তার স্তরভাগ

মানুষ যেভাবে ধর্মচিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে তার স্তরভাগ করলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ দেখা যায়, যেমন—আদিম (primitive), প্রাচীন (archaic), ঐতিহাসিক (historic), প্রাক্ আধুনিক (early modern) ও আধুনিক (modern)। আধুনিক 'ধর্ম' এখনো পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার পথে—যেটি বিজ্ঞানের তথ্য ও যুক্তিবোধের সঙ্গে উপযোগী হয়ে, মানবিকতার সমস্ত সৎ মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে ; কিন্তু এটি এখনো সম্ভাবনা এবং কিভাবে, কবে হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এবং এই 'ধর্ম' আদিম চিন্তার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হওয়া ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা থেকে মুক্ত হয়েই সৃষ্টি হবে—অন্তত ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি তাই। এখনকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের থেকে তা হবে গুণগতভাবেও পৃথক। অন্ধবিশ্বাস, অনড় অচল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি তথা ধর্ম সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত ধারণা থেকেই তা মুক্ত হবে। কিন্তু এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এ সত্য জানতে পারছে যে ঈশ্বর বিশ্বাস, অতি প্রাকৃতিক ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তথা প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সব ধর্মমতই তাদের পূর্বসূরীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা, স্থূল গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা, প্রয়োজন ইত্যাদির তাগিদে সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির বিকাশের ইতিহাসে ক্রমশ আধুনিকতর 'ধর্ম' সৃষ্টির পথ সুগম করেছে।

পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের সমাজ জীবনের আদিম অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি

রেখেই কিভাবে ধর্মচিন্তার আদিম রূপটি মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসে পল্লবিত হয়েছে তার একটি আভাস আগে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে শেষ হওয়া পুরা-প্রস্তর যুগের শেষের দিকেই এটি একটি সংহত রূপ পায়। এখনকার গবেষকরা যাকে সর্বপ্রাণবাদ (animism, animatism) নামে অভিহিত করছেন, ঐ চিন্তাগত পদ্ধতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। জড় বস্তুর মধ্যে কোনো শক্তি বা প্রাণের কল্পনা করাকে জড়াত্মবাদ (animatism) বলা যায়। একটি পাথরকে বা মাটির মূর্তিকে অলৌকিক শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজা করার তথা সন্তুষ্ট করার যে পদ্ধতি এখনো চালু আছে এটি এরই একটি বিকশিত রূপ। এ ধরনের পাথর ইত্যাদিকে fetish নামে অভিহিত করা হয়। আদিম মানুষ প্রায় সব জড় বস্তুতেই এ-ধরনের কোনো একটি শক্তির কল্পনা করেছে—তার বাস্তব ভিত্তিও ছিল, যদিও তার থেকে সিদ্ধান্তটা ছিল ভ্রান্ত। একটি পাহাড়ের আড়ালে থাকা জনগোষ্ঠী দেখেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পাহাড় তাদের রক্ষা করে, আবার পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর বা ধ্বস তাদের ধ্বংসও করে। তাই পাহাড় তার কাছে নিশ্চয়ই একটি শক্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা পদ্ধতিরও 'আবিষ্কার' করেছে আদিম মানুষ। ধীরে ধীরে মানুষ তার কল্পনাকে আরো প্রসারিত করেছে। বজ্র, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, জল—প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই সে এ ধরনের একটি শক্তির কল্পনা করেছে—যে পদ্ধতিকে এখন সর্বপ্রাণবাদ (animism) হিসেবে বলা যায়। সর্বব্যাপী, রহস্যময়, ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন একটি অলৌকিক শক্তির এই কল্পনাপদ্ধতিই পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠিতে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে—যেমন সংস্কৃতে ব্রহ্ম, প্রাচীন জার্মানিতে হামিঙ্গা, সিয়ক্স-এ ওয়াকাণ্ডা, মেলানেশিয়ায় মানা ইত্যাদি—কিন্তু সে অনেক পরের ব্যাপার।

স্যার এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলরের মতে এই সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের সবচেয়ে আদিম রূপ। এমিল ডার্কহাইম দেখিয়েছেন, ধর্ম টোটেমবাদ (totemism) থেকে পরে সৃষ্টি হয়েছে (টোটেমবাদের সামান্য পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে), কিন্তু আদিম মানুষের জীবনে এই টোটেমবাদ ছিল সর্বপ্রাণবাদী চিন্তাধারাই। স্যার জেমস ফ্রেজার দেখিয়েছেন রহস্যময় ক্রিয়াকাণ্ড করার শিল্প, যে-শিল্প দিয়ে নানা অদ্ভুত ক্রিয়া করা যায় এবং অলৌকিক, অতি-প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা যায় বলে ভাবা হয়েছিল, ঐ ম্যাজিক শিল্প

(ম্যাজিক আর্ট) অপবিজ্ঞান (pseudoscience) বা আদিম বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হয়েছিল এবং ধর্ম সৃষ্টি হওয়ার আগেই যথাসম্ভব সর্বজনীনতা লাভ করেছিল, এবং মানুষের মনে এ-সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর ছিল। অর্থাৎ আদিম মানুষ (এ সব ক্ষেত্রেই পুরা-প্রস্তরযুগের মানুষ) তার বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে এ-ধরনের ম্যাজিক তথা তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছে এবং তার নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে, অন্তত সে মনে করেছে এর ফলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অর্থাৎ রহস্যময়, বিপদ সৃষ্টিকারী অদ্ভুত শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট করা যাবে বা বশ করা যাবে। পৃথিবীর ঐসব ম্যাজিশিয়ানদের কাজকর্মে বিভ্রান্ত হয়ে, মানুষ এমন একজনের কল্পনা করেছে যার ক্রিয়াকাণ্ডে (অর্থাৎ প্রকৃতির কোনো শক্তিকে বশ করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতায়) কোনো ভুল হয় না। এই চরম ক্ষমতাধর, অভ্রান্ত, সর্বশক্তিমান একজনই ঈশ্বর-গড-আল্লা হিসেবে নানা ভাষায় পরবর্তীকালে অভিহিত হয়েছে। ফ্রেজারের মতে, ম্যাজিক হচ্ছে মনুষ্য-কেন্দ্রিক ধর্ম এবং ধর্ম হচ্ছে এই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ম্যাজিক। তিনি মানুষের চেতনা বিকাশের স্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আগে সৃষ্টি হয় ম্যাজিক, তারপর ধর্ম, তারপর বিজ্ঞান।

আদিম কালেই মানুষ বাস্তব-অবাস্তব নানা বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছে, ও মেনে এসেছে। কোনো বিশেষ ফল খেলে শরীর খারাপ করে, এটি সে অভিজ্ঞতায় দেখেছে। আবার সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের ভীতিপ্রদ, অস্বাভাবিক ঘটনায় সে নিজেই কিছু আচরণবিধি ঠিক করেছে। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা এ-ধরনের নানা আচরণবিধিকে (taboo) ফ্রয়েড বলেছেন, ধর্মের আদি রূপ। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত সমূহ থেকে একটি জিনিস স্বতঃসিদ্ধ যে, ধর্ম মানুষের সভ্যতার বিকাশে, মানুষের নিজেরই তৈরি করা একটি পদ্ধতি।

প্রচলিত ধর্মমতের তিনটি দিক রয়েছে—বিশ্বাস (belief), অনুষ্ঠানাদি (worship) ও সংগঠন (organisation)। এই বিশ্বাসের ধারাটি সৃষ্টি হয়েছে ও সংবদ্ধ হয়েছে পুরা-প্রস্তরযুগে। পুরা-প্রস্তরযুগের শেষ ২০,০০০ বছরে কি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, কি তথাকথিত আদিম ধর্মবিশ্বাস অতি দ্রুত বিকশিত হয়েছে। মানুষ যেমন তার পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র কিছুটা উন্নত করেছে, তেমনি ম্যাজিক ও অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানাদিও নিয়মিত অনুসরণ করতে শুরু করেছে—যদিও তা আদিমভাবে। বিচিত্র

অঙ্গভঙ্গি করে, নানা ধরনের ছবি এঁকে, বিচিত্র শব্দ করে ইত্যাদি নানাবিধভাবে সে রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তি ও কল্পিত শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এই সব ক্রিয়াকাণ্ড পুরুষানুক্রমে করতে করতে সে তাতে অভ্যস্ত যেমন হয়ে উঠেছে, তেমনি তাদের মধ্যে সে পেয়েছে দৈনন্দিন সমস্যাসংকুল জীবনে বৈচিত্র্য ও আনন্দ। আরো পরে এগুলিই বিকশিত হয়ে নৃত্যকলা, অঙ্কনশিল্প, সঙ্গীত শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে—ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূতও হয়েছে। স্বপ্ন দেখার মতো অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতা আদিম মানুষের মনে আত্মা সম্পর্কিত বিশ্বাসের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করেছে। এই টোটেম-ট্যাবু-আত্মা ইত্যাদি বহু বিশ্বাস ক্রমশ তার মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তখনো ছিল আদিম অবস্থায়, ধর্মীয় সংগঠন তো ছিল না বললেই চলে।

নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে এর সূচনা এবং ৬ হাজার বছর আগে পূর্ণভাবে বিকশিত। মানুষ নিছক খাদ্য সংগ্রাহক নয়, খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠল। কৃষিকর্ম, পশুপালন, মৃৎশিল্প, কাপড় বোনা, উন্নততর বাড়ি তৈরি করা বিশেষ করে হ্রদের উপর বাড়ি বানানোর মতো যুগান্তকারী আবিষ্কার সে করেছে। এ-সবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাদুবিদ্যা তথা 'দেবদেবী ও দুষ্ট আত্মাদের' বশে রাখা ও সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'ধর্মীয়' অনুষ্ঠানাদিরও আমূল পরিবর্তন সে ঘটাতে থাকে নিত্য-নতুন প্রয়োজনে। মাটির উর্বরতা বাড়ানো, বেশি ফসল ফলানো, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি আটকানো, পশুর মড়ক আটকানো ইত্যাদি ধরনের নানা বিচিত্র উদ্দেশ্যে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও বিশ্বাসের জন্ম হতে থাকে—বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে। (অথর্ববেদে যেমন পরিবর্তিকালে এরই ধারাবাহিকতায় বৃষ্টি কামনা, শত্রু-নিবারণ, পশুপোষণ, গাভীর রোগ উপশম থেকে শুরু করে পলায়নপর স্ত্রীর নিবারণ, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের ক্রোধ অপনয়ন, জ্বরের চিকিৎসা, কৃমির চিকিৎসা, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠের চিকিৎসা ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে বৈদিক মন্ত্র উল্লেখ করা আছে। কোন নিষ্ঠাবান হিন্দুও এখন আর এসব অনুসরণ করেন না। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বুশম্যানদের মত আদিম অধিবাসীরা এখনো এ ধরনের মন্ত্র-তন্ত্র প্রার্থনায় বিশ্বাসী; তাঁদের একটি মন্ত্র বাংলায় এরকম—'হে চাঁদ! কাল আমি যেন একটি বারশিঙা হরিণ

মারতে পারি তুমি ঐ উঁচু থেকেই তার ব্যবস্থা কোরো। ঐ হরিণের মাংস আমাকে খেতে দাও। আমার তীর দিয়ে ঐ হরিণকে আমায় মারতে দাও। ·· আমি মাটি খুঁড়ছি পিঁপড়ের জন্য। আমাকে খেতে দাও।' এ কথা-গুলিকেই সুললিত সংস্কৃতে অনুবাদ করলে হুবহু একটি বৈদিক মন্ত্র হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়।)

কল্পিত শক্তিকে সন্তুষ্ট করা বা অপশক্তিকে দূরে রাখার জন্য এ-ধরনের নানা অনুষ্ঠান বা পুজার (worship) জন্ম হয় এবং যার অনেকটাই বিকাশ ঘটেছে বিগত হাজার হাজার বছর ধরে। এ ধরনের অনুষ্ঠান কয়েক ধরনের হতে পারে—

ক. আনুষ্ঠানিক নাটক,

খ. প্রার্থনা,—এটি আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন কিছু পাওয়ার জন্য আবেদন, কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি, প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানানো (thanks giving), 'তাঁর' সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি প্রকাশ করা, ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। হিন্দুদের বেদ-উপনিষদ, মুসলিমদের কোরান, খ্রীস্টানদের বাইবেল-টেস্টামেণ্ট সহ সব ধর্মগ্রন্থেই এসবের ধারাবাহিকতার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। এসব কথা যে ঔ নব্য-প্রস্তরযুগীয় প্রার্থনা পদ্ধতির বিকশিত, সূত্রবদ্ধ রূপ তা স্পষ্ট। ধর্মচেতনার প্রাচীনতম বহিঃপ্রকাশের একটি হলো প্রার্থনা।

গ. নাচ,

ঘ. বিশেষভাবে কথাবার্তা বলা (বিভিন্ন ভাষার শ্লোক বা মন্ত্র),

ঙ. ব্যক্তি বা বস্তুকে পুজা করা,

চ. ধর্মোপদেশ,

ছ. নীরবে ধ্যান,

জ. ধর্মীয় গান-বাজনা,

ঝ. শরীরকে বিশেষ ভঙ্গিমায় নিয়ে যাওয়া,

ঞ. আনুষ্ঠানিক অঙ্গভঙ্গি,

ট. অঞ্জলি, উৎসর্গ, বলি দেওয়া,

ঠ দেবতার উদ্দেশে বিশেষ কিছুকে সাজানো। এখনকার প্রচলিত নানা ধর্ম ও লোকাচার থেকে এসবের প্রত্যেকটির উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নব্য-প্রস্তরযুগে। তাই ঐ সময়কার

ধর্মকে আদিম ও ঐতিহাসিক ধর্মের মাঝামাঝি প্রাচীন ধর্ম নামে চিহ্নিত করা যায়। এখনো বহু আদিবাসী গোষ্ঠী, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও, এই আদিম ও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের নানা কিছু অবশিষ্ট আছে।

তথ্যের স্বার্থে এটি জানা দরকার যে, পুরা ও নব্য-প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি মধ্য-প্রস্তরযুগ (mesolithic period) নামে একটি সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তর পৃথিবীতে শুধুমাত্র উত্তর পশ্চিম ইয়োরোপে দেখা গিয়েছিল। পুরা-প্রস্তরযুগের কাটা পাথর (chipped stone) ও নব্য-প্রস্তরযুগের মসৃণ করা পাথর (polished stone)-এর মধ্যবর্তী স্তরটি ছিল পাথরের ক্ষুদ্র অস্ত্রাদি (microlith) আবিষ্কারের সময়। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০-২৭০০ বছর সময়কাল ব্যাপী এই তথাকথিত মধ্যপ্রস্তরযুগে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ, নব-প্রস্তরযুগ থেকে গুণগতভাবে পৃথক কিছু ছিল না। তবে স্বাভাবিকভাবেই পুরনো ধ্যানধারণার পরিমার্জনা ঘটেছে।

কিন্তু নব্য-প্রস্তরযুগে কি সমাজে, কি ধর্মীয় বিশ্বাসে একটি গুণগত বিকাশ ঘটে। সেটি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি এবং বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থে ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতিকে ব্যবহার করা। মানুষ খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠেছে, নিজের পরিবেশের উপর আধিপত্য করার ও পরিবেশকে পাল্টানোর ক্ষমতা ধীরে ধীরে অর্জন করেছে. মোটামুটি স্থায়ী গ্রাম সৃষ্টি করেছে এবং ছোট ছোট সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গোষ্ঠীরই স্বার্থে বিশেষ এক একজনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষা, খাদ্যোৎপাদন ইত্যাদির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তিনি বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি কল্পিত অলৌকিক শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করা, দূরে রাখা বা বশীভূত করার জন্য অনুষ্ঠানাদি করার দায়িত্ব পেলেন। সুনির্দিষ্ট-ভাবে সৃষ্টি হলো এখনকার পুরুতঠাকুর, মোল্লাসাহেব বা যাজকবাবাজিদের পূর্বসূরীর। গোষ্ঠিরই স্বার্থে তাঁরা ধর্মানুষ্ঠানকে ব্যবহার করতেন, বিভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়মকানুন পালন করতেন। কিন্তু পাশাপাশি সমাজের এই গোষ্ঠীপতি ও ধর্মগুরুরা ছিলো অতি সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁদের সুযোগ-সুবিধাও ছিল বেশি। এই সময়কার কবরখানায় এই শ্রেণীগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজনের কবরে প্রচুর হাঁড়ি-কুঁড়ি, পাথরের অস্ত্র এবং এমনকি অন্য কঙ্কালও পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বহুজনের কবরই নেহাতই অনাড়ম্বর, সাদামাঠা।

অবশ্য নব্য-প্রস্তরযুগে শবদাহপদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এর নিদর্শন পাওয়া যায়—কোথাও ব্যাপকভাবে, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে। কোনো কোনো এলাকায় কম। যেমন ইউরোপের উত্তর ফ্রান্স অঞ্চলে এর প্রমাণ পাওয়া গেলেও বৃহত্তর ইউরোপে যথাসম্ভব এটি জানা ছিল না। মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললে কল্পিত ঐ আত্মা হয়তো নিশ্চিতভাবে দেহমুক্ত হতে পারবে এ-রকম ধারণা বোধহয় করা হয়েছিল। অথবা বাস্তব প্রয়োজনে (যেমন পচন আটকানো ইত্যাদি) হয়তো দাহপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, পরে তাতে আত্মাসংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ব্যাখ্যার সংযোজন করা হয়। ঠিক কি ধারণা করা হয়েছিল, তা এখনো বিতর্কিত, তবে এই দাহপদ্ধতির সঙ্গেও নানা অনুষ্ঠানাদি করা হতো—কবর দেওয়ার মতোই, যাতে দেহমুক্ত আত্মা 'সুখে থাকতে' পারে এবং জীবিতদের ক্ষতি না করে।

এইভাবেই ধীরে ধীরে তথাকথিত নানা ধর্মবিশ্বাসের নানাবিধ দিক যুক্ত হতে থাকে অর্থাৎ এখনকার প্রচলিত ধর্মের নানা চিন্তাগত ও ব্যবহারগত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আদিম ও প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসে বিশ্বাস ও পূজার্চনাদির ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হলেও, এখনকার অর্থে সাংগঠনিক রূপটি সে পায় নি। অবশ্য টোটেম ধারণার উত্তরসূরী হিসেবে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট করতে শুরু করেছিল। এর ধারাবাহিকতা এখনো আদিবাসিগোষ্ঠীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যেমন, ভারতে বিরহোড়দের মধ্যে ৩৭টি গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১২টি জন্তু জানোয়ারের নামে, ১০টি গাছের নামে, ৮টি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হিন্দুধর্মের জাতপাত বা এলাকার নামে এবং বাকি ৭টি নানা নানা বস্তুর নামে। এই ধরনের কিছু কিছু সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তখনো দৃঢ় হয় নি—যা হয়েছে তা পরে, ধর্মবিকাশের ঐতিহাসিক স্তরে—যখন বিশেষ নামের সুসংহত ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা অঞ্চলে নানাবিধ নাম পরিগ্রহণ করেছে।

পৃথিবীতে নাস্তিক ও অধার্মিকের সংখ্যা

ঈশ্বর বা কোনো ধর্মে মতি না থাকলে অর্থাৎ বিশ্বাস না করলে 'ইহকাল পরকাল ঝরঝরে' এরকম ভাবার কারণ নেই। এ বিশ্বাস অত্যাবশ্যকও নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ তথাকথিত নাস্তিক (atheist) কিংবা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না, কোনো ধর্মমত অনুসরণ করেন না অর্থাৎ তথাকথিত অধার্মিক (nonreligious)। সব সময়েই এরকম মানুষ কমবেশি ছিলেন। সমাজের একজন মানুষ হিসেবেই এঁরা নিজেদের গণ্য করেন। কিন্তু কয়েক দশক আগেও এঁদের সরকারি পরিসংখ্যান ছিল না। পরের পাতায় পৃথিবীর মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি দেশে এ ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা দেওয়া হলো। অবশ্য নানা অপকৌশলে এসব দেশের মানুষের মধ্যে কাল্পনিক ঐ ঈশ্বরে বা প্রাচীন ধর্মে মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চলছে। আবার অন্য দেশেও, সরকারি হিসেবে না থাকলেও, এমন মানুষ বিরল নয়। যেমন ভারতে সরকারি হিসেবে নাস্তিক- অধার্মিক না দেখান হলেও, এমন মানুষ যে আছেন তা আমরা জানি। এ ধরনের ব্যক্তিদের উচিত, আদমসুমারিতে সরকারিভাবে এঁদের এই দিকটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। স্পষ্টতই তথাকথিত কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দেশ শুধু নয়, ননকম্যুনিস্ট বা অ-সমাজতান্ত্রিক দেশেও এমন ব্যক্তি যথেষ্ট রয়েছেন। উভয়দেশেই বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তিও প্রচুর রয়েছেন, যেমন চীনে লৌকিক ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা ২২ কোটি ৫২ লক্ষ, বৌদ্ধ ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ইত্যাদি। যে-সব দেশের শুধু নাস্তিকের বা শুধু অ-ধার্মিকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এমনটি নয় যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরেবিশ্বাস করেন বা নাস্তিকেরা ধর্মে বিশ্বাস করেন ; আসলে আদম সুমারির পদ্ধতি ও নিজেরা নিজেদের যেভাবে পরিচিত করান ঐ হিসেবেই পরিসংখ্যানটি করা হয়েছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে যে যার নিজের ধর্ম বা বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন। এছাড়াও দেখা গেছে, বিভিন্ন দেশের যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিশেষ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত, তাঁদের মাত্র প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ধর্মাচরণ করেন।

পৃথিবীর মোট ২২০টি দেশে নাস্তিক-অধার্মিক ব্যক্তিরা রয়েছেন। এখানে কয়েকটি দেশে তাঁদের সংখ্যা দেওয়া হল।

দেশ	নাস্তিক ব্যক্তির সংখ্যা—	অধার্মিক ব্যক্তির সংখ্যা—
অস্ট্রিয়া	উভয়ে মিলে	৪·৬ লক্ষ
অস্ট্রেলিয়া	—	২১·৭ লক্ষ
আলবেনিয়া	৬·১ লক্ষ	১৮·১ লক্ষ
ব্রাজিল	উভয়ে মিলে	২১·০ লক্ষ
বুলগেরিয়া	-৫৮·০ লক্ষ	—
কানাডা	—	১৯ ৬ লক্ষ
চীন	১৩·৪৫ কোটি	৬৬·৩৪ কোটি
কিউবা	৬·৮ লক্ষ	৫১·৬ লক্ষ
চেকোস্লাভাকিয়া	৩১·৫ লক্ষ	—
ফ্রান্স	১৯ ৩ লক্ষ	৬৯ ১ লক্ষ
পশ্চিম জার্মানি	৫ ৬ লক্ষ	২২·৯ লক্ষ
পূর্ব জার্মানি	বিশেষ ধর্মমতে নথিভুক্ত নয়	৭৬·৭ লক্ষ
ইতালি	১৫·০ লক্ষ	৭৮·২ লক্ষ
উত্তর কোরিয়া	উভয়ে মিলে	১ কোটি ৫৫·৭ লক্ষ
ম্যাকাউ	—	২৩·৬ লক্ষ
মেক্সিকো		২৫·৬ লক্ষ
মঙ্গোলিয়া	উভয়ে মিলে	১৩·৮ লক্ষ
নেদারল্যাণ্ড্স	—	৪৮·৭ লক্ষ
নিউজিল্যাণ্ড	—	৫·৫ লক্ষ
রুমানিয়া	১৬·৩ লক্ষ	২০·৯ লক্ষ
হাঙ্গেরি	৭·৬ লক্ষ	১৩·৫ লক্ষ
সিঙ্গাপুর	—	৪৭·৮ লক্ষ
সোভিয়েত রাশিয়া	৫ কোটি ৯৩·৭ লক্ষ	৮ কোটি ৬১·২ লক্ষ
ইংল্যাণ্ড	—	৫০·৫ লক্ষ
আমেরিকা	উভয়ে মিলে	১ কোটি ৬৯·৯ লক্ষ
ভিয়েতনাম	উভয়ে মিলে	১ কোটি ২২·৪ লক্ষ
যুগোস্লাভিয়া	উভয়ে মিলে	৩৯·৭ লক্ষ
		ইত্যাদি
মোট—	২৩ কোটি ৩০ লক্ষ	৮৬ কোটি ৬০ লক্ষ

নব্য-প্রস্তরযুগের শেষের দিকেই কীভাবে মানুষের মধ্যে প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয় এবং মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীনেতার স্বার্থে জনসাধারণের ঐ ঐশ্বরিক, অলৌকিক বিশ্বাসকে কীভাবে কাজে লাগানো শুরু হয়, তাও এখন জানা গেছে। এখন থেকে প্রায় ৫000 বছর আগে নব্য-প্রস্তর যুগ শেষ হয়। এর শেষ দু-হাজার বছরে মানুষ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে—প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতায়, নিজের শ্রম ও মস্তিষ্কের বলে। মানুষের সভ্যতার বিকাশে, তার সাংস্কৃতিক চেতনার রূপান্তরে এই প্রতিটি আবিষ্কারই অবশ্যম্ভাবী ছাপ ফেলেছিল। একই ছাপ পড়েছে ওতপ্রোতভাবে মিশে

> বিপুলা প্রকৃতি ও রহস্যময় পরিবেশের তুলনায় মানুষের আপাত ক্ষুদ্রতা, শক্তিহীনতা ও অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আদিম মানুষের মনে তথাকথিত ধর্মচিন্তার উন্মেষ ঘটে। ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরো বিকশিত কল্পনার সাহায্যে সৃষ্ট করা নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধি করার প্রাথমিক ইচ্ছাও মিশেছিল এই ধর্ম উদ্ভবের প্রক্রিয়ায়।

থাকা তার ধর্মচিন্তার বিকাশ ও পল্লবিত হওয়ার প্রক্রিয়াতেও। মাটির জিনিস তৈরী করা, ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার (প্রথমে সোনা তারপর তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল—এবং সবশেষে লোহা*), কৃত্রিম সেচব্যবস্থা, নদীকে পোষ মানানো, চাকার আবিষ্কার, পাল তোলা নৌকার ব্যবহার, লাঙলের ব্যবহার, চাষের কাজে গবাদি পশুর ব্যবহার, আদিম পঞ্জিকার উদ্ভাবন, সংখ্যার ব্যবহার, ইট আবিষ্কার করে তা দিয়ে ঘরবাড়ি বানানো, লেখার পদ্ধতি—একের পর এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার মানুষের সমাজ, সভ্যতা, চিন্তাভাবনা সব কিছুকে প্রভাবিত করতে থাকে।

এসবের ফলে মানুষের উৎপাদিকা শক্তি অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়তে থাকে। একজনের অধীনে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। আগের মতো সবাইকে খাদ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন আর থাকে না, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সম্পদের লেনদেনের নিয়মকানুন ও নিয়ন্ত্রণ করার তথা নেতৃত্বদায়ী শক্তির প্রয়োজন হতে থাকে। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকেই সমাজ-

* লোহা অবশ্য নব্য-প্রস্তর যুগের আবিষ্কার নয়, এ যুগ শেষ হয়ে ঐতিহাসিক সময় শুরু হওয়ারও দেড়-দু-হাজার বছর পরে লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটে। তবে সর্বত্র একই ধারাবাহিকতায় হয় নি। যেমন আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশেই প্রস্তর যুগের পরেই লৌহ যুগ শুরু হয়েছে।

ব্যবস্থার এই রূপান্তর আভাসিত হয়। কিন্তু তার পরবর্তী ঐতিহাসিক কাল যখন শুরু হয়, তার মধ্যেই এই নেতৃত্ব একটি প্রয়োজনীয় শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নব্য-প্রস্তর যুগের ছোট ছোট গ্রামের তুলনায় বড় বড় জনপদের জন্ম হয়। মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক না থেকে খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠার ফলে এবং অন্যান্য উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল আয়ত্ত করার ফলে কিছু মানুষের হাতে বাড়তি সময় জুটে যায়। এই মানুষেরা সংখ্যায় কম হলেও তারা উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মে সময় দিতে সক্ষম হয়। এদেব বুদ্ধি-বিচারও তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল—এরাই রাজা, পুরোহিত, গোষ্ঠীপতিব ভূমিকা নেয় এবং এদের অনুগত হিসেবে কিছুজন শাসনপ্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ব্যাপকতর জনগোষ্ঠী এই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর অধীনস্থ হয়। শুরুর দিকে এ প্রক্রিয়া প্রয়োজন আকারে এসেছে,—সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক নির্দেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে। এই প্রয়োজনের স্বার্থেই নানা নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, আইন ও শৃঙ্খলার প্রচলন কবতে হয। এসবগুলিতেই মানুষের কল্পনার ঈশ্বর আর অতি-প্রাকৃতিক, ভীতিপ্রদ, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসও সম্পৃক্তভাবে মিশেছিল। আর এভাবেই ঐতিহাসিক পর্যায়ের ধর্মের উদ্ভব।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ তুলনামূলকভাবে দরিদ্র থাকলেও, সে কারোর দাস ছিল না—দাসত্ব কেবল ছিল তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কাছে, কল্পিত ভয়াবহ পরমশক্তিমান ঈশ্বরেব কাছে—কিন্তু কোন মানুষের কাছে নয়। তাই তখনকাব ধর্মচিন্তায বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের প্রতিভূর আসনে বসানো হয় নি, বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মাচরণ পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুশাসন তখন ছিল অনুপস্থিত ; এগুলি এসেছে পরে।

বৈষম্যের জন্ম—ধর্ম তার সহায়ক

অন্যদিকে ঐতিহাসিক যুগে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগের ফলে, সৃষ্টি হলো গরিষ্ঠ সংখ্যক দাসের। শুরুর দিকে দাসেদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক বৈরিতামূলক মোটেই ছিল না—বরং ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরতা-ভিত্তিক। কিন্তু উৎপাদন ও উৎপাদিকা দ্রব্যের সুষ্ঠু বণ্টন, শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে একদা যে গোষ্ঠীপতির সৃষ্টি হয়েছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তথা সভ্যতা বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়,

এই ব্যবস্থাই সৃষ্টি করল শাসকতন্ত্রের। বিপুল-সংখ্যক দাসকে সুশৃঙ্খল, আজ্ঞাবহ, অধীনস্থ বাহিনীতে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল-অজ্ঞতা ও কল্পনার সন্তান ঐ ঈশ্বর ও ধর্মচিন্তা। সৃষ্টি হলো পাপপুণ্য-বোধ, ঈশ্বরের অভিশাপ-আশীর্বাদ ইত্যাকার নানাবিধ কৌশল (এবং আরো পরে কর্মফল, পূর্বজন্ম-পরজন্মের ধারণা)।

এর ফলেই মিশরের সম্রাট গগনচুম্বী পিরামিড বানিয়ে নিজের অনশ্বরতা প্রতিষ্ঠার অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করতে পেরেছে—কত সহস্র দাসের মৃত্যুভয়কাতর শ্রমের বিনিময়ে। পিরামিড যুগের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের কবরের পাশাপাশি, সম্রাটের পিরামিড দেখলে এই চূড়ান্ত বৈষম্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় (মোঅন্‌জোদড়ো অর্থাৎ মৃতের স্তূপ) এই সুবিপুল রাজদম্ভের বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাসগৃহের তুলনায় দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের অপরিসর ঘরের বৈষম্য বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই সিন্ধু সভ্যতাও নব্য-প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে ঐতিহাসিক কাল শুরুর সময়েই মূলত বিকশিত হয়েছিল। (এই অঞ্চলে খ্রীস্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ নাগাদ প্রথম বসতি স্থাপন করে ভূমধ্যসাগরীয় অ্যাল্পিনয়েড-মঙ্গোলয়েড-অস্ট্রালয়েডদের মিশ্রদল ; খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ থেকে ২৫০০ অব্দ—এই সময়কাল এর সবাধিক বিকাশের সময় বলে জানা গেছে।) এবং পরবর্তীকালে 'সভ্যতা' যত এগিয়েছে এই বৈষম্য, এই শ্রেণীবিভাজন আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই চতুর একনায়ক বা শাসক ও তার অনুগত, শাসকশ্রেণীর অংশীদার বাহিনী শ্রমজীবী গরিষ্ঠতর অংশকে নিজেদের অধীনস্থ রাখার জন্য—তাদের সবাকার কল্পিত ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক শক্তিকে কাজে লাগায়। দ্বিধাহীন দাসত্ব ও প্রশ্নহীন আনুগত্য তখন ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ পদ্ধতির সম্পৃক্ত অংশ হয়ে দাঁড়াল। ধর্মের আবরণে নানা গল্পকথার সৃষ্টি হলো এই প্রয়োজনে।

এর ফলে সমাজের বেশিরভাগ মানুষেরই কাজ হয়ে দাঁড়াল রাজা-পুরোহিত-শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করা। এর একটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মানুষের জ্ঞানের বিকাশে। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে মানুষ আরো অজ্ঞ, আরো অনভিজ্ঞ থাকলেও সামাজিক উৎসাহ পাওয়ার ফলে, যৌথ দায়িত্ব ও যৌথভাবে উপভোগের সম্ভাবনা থাকার ফলে, এবং একই সঙ্গে

ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু বাড়তি সময় পাওয়ার ফলে, তাদের পক্ষে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু নব্য-প্রস্তর যুগের পরবর্তী ২০০০ বছরে অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যতা শুরুর তথা ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার প্রথম ২০০০ বছরে মানুষের চিন্তা-চেতনায় এই দাসত্বের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় তার বিজ্ঞান চর্চাও অবরুদ্ধ হয়। এই সময় মাত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে বলে ঐতিহাসিকেরা দেখেছেন—যেমন, দশমিক পদ্ধতি (২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), লোহার আবিষ্কার (১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), বর্ণমালার আবিষ্কার (১৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) এবং শহরাঞ্চলে বা লোকবসতি অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালীর আবিষ্কার (৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। স্পষ্টতই সমাজ-ব্যবস্থায় দাসত্বের মানসিকতা ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে দৈন্য আসে, নতুন আবিষ্কারের উৎসাহ যে হারিয়ে যায় তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

এবং এই দাসত্বের বিকাশের সময় এই গরিষ্ঠ অংশ মানুষের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায় ও প্রক্রিয়া ছিল ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তা (যে ধারাবাহিকতা আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলির বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এখনো রয়েছে)। কল্পিত ঈশ্বরকে ভক্তি-পূজা করলে পুণ্যলাভ হবে, মর্ত্যে না হোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা যাবে ইত্যাদি ধরনের বিশ্বাস রাজা-পুরোহিতরা নানা কৌশলে তাদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে, এবং এরাও এ ধরনের বিশ্বাসকে আপাত শান্তিতে বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা হওয়া উচিত ছিল আরো পরিমার্জিত ও সময়োপযোগী। কিন্তু তা না হয়ে ক্রমশ সেটি মানুষের সভ্যতার চাকাকে আরো পিছিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হতে থাকল। এই সময় পর্যায়ে যতগুলি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে, প্রায় সবক্ষেত্রেই এই দাসত্বের জড়তা, শাসকশ্রেণীর বিলাস, ক্রমবর্ধমান অত্যাচার শোষণ ও দম্ভ আর ধর্মের প্রতারক ব্যবহার কমবেশি স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের উৎপাদিকা শক্তি একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছানোর পর, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী উদ্ভবের ফলে সাংস্কৃতিক চিন্তা তথা ধর্মবিশ্বাসের এমনতর ব্যবহার পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝেই এমন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল—কিন্তু তা পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের পর্যায়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে শাসকগোষ্ঠী যে নিত্যনতুন নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছিল, তার ধারাবাহিকতা এখনকার বহু ধর্মের মধ্যেই রয়েছে। ঐতিহ্যের নামে, পূর্বপুরুষের প্রতি বিশ্বস্ততার নামে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতার নামে এই সব ধর্মানু-শাসনকে এখনো আঁকড়ে রাখার মানসিকতা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যেই স্পষ্টভাবে রয়েছে বা এই নিকট অতীতেও ছিল।

ব্রোঞ্জ যুগের শ্রেণীবিভাগের সুস্পষ্ট ছাপ কবর দেওয়ার মতো 'ধর্মানুষ্ঠানে'র মধ্যে দেখা যায়। অজস্র সাধারণ কবরের পাশাপাশি দু-চারটি কবরের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে অজস্র মূল্যবান জিনিষপত্র, ঘোড়া এবং অন্য মানুষেরও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল রাজা, রাজপুত্র, গোষ্ঠীপ্রধানের কবর। মৃত্যুর পরেও যাতে তার আত্মা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে ঐ উদ্দেশ্যেই তার দাসদাসীদেরও কবর দেওয়া হতো—হয়ত বা জ্যান্তই। তাদের কবরের উপর বিরাট বিরাট পিরামিডও তৈরী করা হতো—এখনো যেমন ছোট হলেও ফলক বা সৌধ গড়ে দেওয়া হয়। এখনো—মৃত্যুর পরে—একই চিন্তার ধারাবাহিকতায় পিণ্ডদান, শেষ পারানির কড়ি, তৈজসপত্র-অলঙ্কারাদি উৎসর্গ করা ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত আছে। এবং এক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের 'আত্মার শান্তি'র আয়োজনেও বাস্তব বৈষম্য প্রকট। এই কয়েক-শ' বছর আগে দাসদাসীদেরও প্রভুর সঙ্গে কবর দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে তা বে-আইনী। তা হলেও মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও ঐ জীবনকে সুখী রাখার মূল চিন্তাটি কয়েক হাজার বছরেও প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্রোঞ্জ যুগে সূর্যের উপাসনাও (solar cult) একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী ভিত্তি পায়। এ যুগের এমনতর নিদর্শন পৃথিবীর নানা অংশেই ছড়িয়ে আছে। যেমন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ঘোড়ার টানা ব্রোঞ্জের রথ—তার ওপরে সূর্যচক্র, স্পেনে ব্রোঞ্জের ঘোড়ার মূর্তির পায়ের কাছে ও মাথায় সূর্যের অবয়ব, সুইডেনে রথের চাকায় সূর্যের প্রতীক ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় সূর্যবংশের কল্পনাও এসেছে—যার ছাপ যেমন পড়েছে ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যে।

ব্রোঞ্জ যুগে সূর্যকে ঘিরে এরকম ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও গুরুত্বপ্রদানের ব্যাপারটি স্পষ্টত এসেছিল কৃষির বিকাশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। মানুষ অনুভব করেছে সূর্যই এই কৃষির প্রধান নিয়ন্ত্রক। অন্যদিকে শ্রেণীবিভাজনের

ব্যাপারটিও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজে যারা শাসকগোষ্ঠী তারা নিজেদের সূর্যবংশীয় অর্থাৎ সরাসরি সূর্য থেকে তাদের জন্ম —এরকম একটি অন্ধ ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে; উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শক্তিমত্তা, আভিজাত্য ও প্রশ্নাতীত নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা।

লৌহ যুগে (শুরু প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে) মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদনের হাতিয়ার আরো সহজ ও উন্নত হতে থাকল। এর কিছু সময় পরে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটে—যাতে দাসব্যবস্থার অন্যতম চূড়ান্ত একটি রূপ লক্ষ্য করা যায়।

তবে পৃথিবীর সর্বত্র যে একই সময়ে একইভাবে এই নব্য-প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহ যুগের বিকাশ ঘটেছে এবং একইভাবে ধর্ম আর তার নানা অনুশাসন, বিশ্বাস ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে—তা আদৌ নয়। এখনো যেমন পৃথিবীর নানা প্রান্তে তথাকথিত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নব্য-প্রস্তরযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জটিলতর বা উন্নততর নানা আধুনিক ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আবার বিপুল সংখ্যক মানুষ তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতেও পেরেছেন। এই মুক্তি নিছক ধর্মবিশ্বাস থেকে নয়—এটি সামাজিক মুক্তির আর সামাজিক পরিবর্তন-পরিমার্জনের ইচ্ছার সঙ্গেও যুক্ত।

আর এই সামাজিক পরিবর্তন-পরিমার্জনের ইচ্ছা শুধু এখনকার নয়, আগেও বারবার ঘটেছে। যেমন হয়েছে আরব অঞ্চলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিহীনতার থেকে মুক্তির আন্দোলনে ইসলামের সৃষ্টি বা দাসব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে খ্রীষ্টধর্মের জন্ম কিংবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবিলতার প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধধর্মের। যখনি সমাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপর মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী তার চূড়ান্ত শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে, আর স্বাভাবিক ভাবে ধর্মকে এ কাজে ব্যবহার করেছে, তখন সমাজের সুস্থ বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এক সময় নতুন নেতৃত্বদায়ী প্রতিবাদী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, যারা সমাজ-ব্যবস্থা তথা ধর্মবিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়েছেন—সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, সামাজিক প্রয়োজনে। কিন্তু এটি পরবর্তী কালের ঘটনা।

নব্য-প্রস্তর যুগের শেষভাগ অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী সৃষ্টির উত্থাপন থেকে পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগ অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার

রূপান্তরে ধর্ম সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, এবং এ কাজ করেছে কিছু-মানুষই—তাকে চালিয়েছে কল্পিত ঈশ্বরের নাম করে।

রাজা বা গোষ্ঠীপতিকে দেবতার আসনে বসানো, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন নামের দেবতা, ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের জন্য ধর্মের ব্যবহার এবং পেশাগতভাবে ধর্মগুরু পদের সৃষ্টি—এসব এই শ্রেণী-বিভক্ত ব্যবস্থায় সম্ভব হয়েছে। ব্যাপক মানুষের মধ্যে আগেই সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন লোকবিশ্বাস অর্থাৎ তথাকথিত নানা ধরনের ধর্মবিশ্বাস ছিলই। এরই সঙ্গে ধর্মগুরু তথা পুরোহিত-যাজক গোষ্ঠী নিত্যনতুন, তাদের সুবিধাজনক, জটিল ও সূক্ষ্ম ধর্মীয় গল্প-কাহিনী, অতিপ্রাকৃতিক ধারণাবলী (যেমন কর্মফল-ব্রহ্ম) সৃষ্টি ও প্রচার করতে থাকল।

শ্রেণীহীন পুরা-প্রস্তর যুগীয়, এমনকি নব্য-প্রস্তরযুগীয় সময়ের চেয়ে ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধর্মের রূপান্তরে আরো কয়েকটি পার্থক্যও রয়েছে। একটি প্রধান তফাৎ হচ্ছে বর্ণমালা তথা লিপির ব্যবহারের ফলে। এর আগে প্রচলিত বিশ্বাস বা ধর্মচিন্তা উত্তরপুরুষের কাছে যেত মূলত শ্রুতির মাধ্যমে, প্রচলিত গল্প-কাহিনী, মৌখিক নির্দেশ ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের শুরুতে লিখিত মাধ্যম ক্রমশঃ প্রচলিত হতে পারায় এই শ্রুতি, এই কাহিনী ও নির্দেশাবলী, গোষ্ঠীর বিশ্বাস ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়—ফলে প্রায় অবিকৃতভাবে উত্তরপুরুষেরা সেগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। আর এর ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিচার থেকে কোন বিশ্বাস বা অনুশাসনকে পরিবর্তিত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। পণ্যের হিসেবনিকাশ, লেনদেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত, শারীরিক শ্রম থেকে মুক্ত বিশেষ যে গোষ্ঠী শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী ও লিখনবিদ্যায় পারদর্শী—তারা ছাড়া এই লিখিত ধর্মানুশাসনকে ব্যাখ্যা করা আর পরিমার্জিত করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আর কারোর রইল না।

সভ্যতার বিকাশে লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার যেমন একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, তেমনি সেটি শাসকশ্রেণীর একটি হাতিয়ারও হয়ে উঠল। শ্রেণীবিভক্তির ফলে মানুষের সব আবিষ্কারই (সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও) এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা শাসককুলের প্রয়োজনে আবিষ্কার করা হয়েছে - ধর্ম-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তখনকার সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এটি ছিল একটি স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় দিক—কিন্তু তার প্রকৃত-

চরিত্র আমাদের জানা দরকার। ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস নিছক বিশ্বাস ও কল্পনা থেকে, সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার এই ঐতিহাসিক পর্যায় মানুষেরই সৃষ্টি করা এবং ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এইভাবেই রাষ্ট্রের তথা জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ধর্মের সৃষ্টি হলো—যেমন মধ্য আমেরিকায় অ্যাজটেক-মায়া-চিবচান (Chibchan)-ইনকা ইত্যাদি ধর্ম, চীনে ইন-তাও-কনফুসিয়াস ইত্যাদি ধর্ম (বা দর্শন), ভারতীয় অঞ্চলে দ্রাবিড়-বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, মিশর-মেসোপটেমিয়া-এশিয়া মাইনর-সিরিয়া-ফিনিসিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম, ইরানীয় অঞ্চলের মাজদা বাদ (Mazdaism) বা জরথুস্ত্র-আবেস্তা-অগ্নিউপাসক ধর্ম ইত্যাদি, ইহুদিদের ধর্ম (Judaism), গ্রীক ও রোমান ধর্ম ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক যুগে ধর্মের এই রাষ্ট্রীয় রূপ এবং ব্যবহার শুধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যেই নয়, সাধারণভাবে মনুষ্য প্রজাতির অর্ধেক অংশ নারীদেরও অবদমিত করার জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অবশ্য শুরু হয়েছে আরো অনেক আগেই—অন্তত নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ দিক থেকে তো বটেই। আরো আগে প্রকৃতিগতভাবে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য থাকার কারণে, জীবনযাপন ও কর্মবিভাগের পদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। কিন্তু কি শারীরিক শ্রম ও দক্ষতা, কি কর্তৃত্ব—কোন ক্ষেত্রেই নারীদের হতমান ও অবদমিত করে রাখার মানসিকতা সৃষ্টি হয় নি। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাও চালু ছিল। নারী প্রাধান্যের অবশেষ এখনো পৃথিবীর নানা উপজাতি বা আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে টিকে আছে, যেমন আফগানিস্থানের এক উপজাতির নারীরা যুদ্ধ করে, শিকার করে আর পুরুষেরা ঘরকন্নার কাজ করে। আফ্রিকার আশান্তি (Ashantee, ডাহোমি (Dahomey) ইত্যাদি গোষ্ঠীর রাজার দেহরক্ষীর কাজ করে নারীরা। সিংহল, কঙ্গো-লোয়াঙ্গো, পেরু ইত্যাদির কোন কোন গোষ্ঠীর নারীরা বহুপতি গ্রহণ করে। এ সব এখন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ মাত্র।

ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টি ও নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ঐ উপযোগী মানসিকতা গড়ে ওঠার ফলে সুনিশ্চিত উত্তরাধিকারী সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হলো। প্রকৃতিগতভাবে মাতৃত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ সম্ভব, কিন্তু পিতৃত্ব নয়। পিতৃপরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অসাধারণ ও

রিকল্পহীন। একমাত্র মায়ের সাক্ষ্যই জানায় সন্তানের পিতা কে অর্থাৎ কোন্ পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের (যা তখনি একটি গোপন প্রক্রিয়ায় পরিগণিত হয়েছিল) ফলে এই সন্তানের সৃষ্টি। পাশাপাশি কোনো নারী যদি একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভবতী হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রে সে নিজেও সুনিশ্চিত হতে পারে না ভাবী সন্তানের প্রকৃত পিতা কে। অন্যদিকে মাতৃত্ব প্রমাণের জন্য পুরুষের সাক্ষ্য বা মতামতের বাস্তবত কোন প্রয়োজন নেই—যখন প্রাকৃতিকভাবেই মায়ের শরীর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষা ও বিকাশের জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব উভয়েরই সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নারীর বিকল্পহীন ক্ষমতা ও ভূমিকার কারণে বিশেষ করে তার জন্যই বিধিনিষেধ ও অনুশাসন প্রয়োজন হয়। এইভাবে মূলত পিতৃত্বের সুনির্দিষ্টকরণের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাদির প্রচলন করতে হয়, যার অন্যতম হলো পুরুষ প্রাধান্য, পরিবার (family)* বিবাহপ্রথা, সতীত্বের ধারণা ইত্যাদি। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হয়—ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাই-ই কিংবা এছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিকাশ সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা তথা পিতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নারীদেরই উপর বিশেষভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা শুরু হয় ক্রমবর্ধমান হারে। এর ফলে আপাত নিরাপত্তা ও সুস্থিতি পাওয়ার ফলে, এবং প্রাকৃতিক কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য, নারীরাও ধীরে ধীরে তা মেনে নেয়—বা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

স্পষ্টত যে ঐতিহাসিক যুগ ব্যক্তিগত সম্পত্তির দৃঢ়ভিত্তি লাভের যুগ, শ্রেণীবিভাজন সুসংহত হওয়ার যুগ, ঐ যুগে ধর্ম যেমন এই ঐতিহাসিক বিকাশকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে—তেমনই এই ঐতিহাসিক বিকাশের অন্যতম প্রধান নির্ধারক বা সহায়ক মাতৃকুলকে নিয়ন্ত্রিত ও অবদমিত করার জন্যও ধর্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ধর্মীয় অনুশাসনকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাচীন সমস্ত তথাকথিত ধর্মীয় সাহিত্যে—পুরুষরাই যার প্রধান সংকলক—এই উত্তরণ (বা অবনমন), এই পরিবর্তন নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সমগ্র নারী জাতি, অন্যদিকে গরিষ্ঠ

* Family কথাটি এসেছে famulus থেকে, যার অর্থ এক মালিকের অধীনে একাধিক দাস বা ক্রীতদাস।

সংখ্যক অনুগত বা দাসেদের মানসিকভাবে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের বিশ্বাসকেও সচেতনভাবে, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এরই সুসংহত বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে রচিত তথাকথিত নানা ধর্মগ্রন্থে। কোরআন যেমন বলা হয়েছে, কোন নারী তার বিবাহিত স্বামীকে ভালো না লাগলেও যদি অন্য কোন পুরুষে অনুরক্ত হয় বা ব্যভিচারিণী হয় তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার কথা, কিংবা স্বামী শুধুমাত্র তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে—সুতরাং নিতান্ত অনুগত থাকাই একমাত্র কাম্য। "পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ্‌ তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাহাদের জন্য) নিজের ধন ব্যয় করে। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুমমত চলিবে এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র হেফাজতে (মান-ইজ্জত) রক্ষা করিবে। আর যে নারীদের কু-স্বভাবের আশংকা কর, তাহাদিগকে নসীহত কর; (যদি না মানে) তাহাদের সহিত এক শয্যায় শয়ন বন্ধ কর, এবং (তাহাতেও যদি সংশোধন না হয়) তবে তাহাদিগকে প্রহার কর, কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের কথা মান্য করে, তবে তাহাদের উপর (অত্যাচারের) কোন বাহানা খুঁজিও না।..." (কোরআন শরীফ অবশ্য অনেক পরবর্তিকালের সামাজিক ও মানবিক শৃঙ্খলার নির্দেশ। এতে ঐ পুরুষ আধিপত্যের দিকটি কেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মেয়েদের সম্পত্তির ভাগ দেওয়া, পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের অধিকার ইত্যাদি নানা মানবিক দিকও নির্দেশিত আছে)। জিহোবা বলেছে, 'বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী মহিলা খোঁজ, তাকে কামনা কর ও নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর...এবং যখনই তুমি তার মধ্যে আর আনন্দ পাবে না, তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে খুশি যাক।' মহাভারতে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীলোক পুরুষদেরই একান্ত অধীন,' 'ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা' কিংবা মনুসংহিতায় বলেছে, 'স্ত্রী জাতি স্বভাবতই ব্যভিচারিণী', 'ইহারা অপদার্থ ইহাই শাস্ত্রস্থিতি' ইত্যাদি।

এরই অন্যাপিঠে ঋগ্বেদে দেখা যায়, কিভাবে গবাদি পশুর সঙ্গে দাসদেরও অবাধে হস্তান্তর করা যেত। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, দাস বা শূদ্র ব্রাহ্মণের চুল ধরলেও রাজা তার হাত কেটে ফেলবেন ইত্যাদি। Exodus-এ বলা হয়েছে, 'তুমি যদি একটি হিব্রু ক্রীতদাস কেন, তবে সে ৬ বছর তোমার সেবা

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির শতকরা হিসাব—

ধর্ম	শতকরা হিসাব		পৃথিবীর যে কটি দেশে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন	
১. খ্রীস্টান	৩২.৯	(৩৩.৩)	২৫১	২৫২)
২. মুসলিম	১৭.১	(১৭.৭)	১৭২	(১৭২)
৩. হিন্দু	১৩.২	(১৩ ৩)	৮৮	(৮৮)
৪. বৌদ্ধ	৬ ২	(৫.৭)	৮৬	(৮৬)
৫. চীনের লৌকিক ধর্মে বিশ্বাসী	৪.১	(৩.৪)	৫৬	(৫৬)
৬. নব্য ধর্মাবলম্বী	২ ২	(২ ৬)	২৫	(২৫)
(১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম)				
৭. আদিবাসী ধর্মাবলম্বী	২.০	(১ ৭)	৯৮	(৯৮)
৮. শিখ	০ ৩	(০.৩)	২০	(২০)
৯. ইহুদী	০ ৪	(০.৩)	১২৫	১২৫)
১০. শামানিস্ট	০.৩	(০.২)	১০	১০)
১১. কনফুসিয়াস-পন্থী	০.১	(০.১)	৩	(৩)
১২. বাহাই ধর্মালম্বী	০ ১	(০.১	২০৫	(২০৫)
১৩. জৈন	০.১	(০.১)	১০	(১০)
১৪. শিণ্টোইস্ট	০.১	(০.১)	৩	(৩)
১৫. অন্যান্য	০.২	(০.৩	১৭০	(১৭০)
অধার্মিক ব্যক্তি	১৬.৪	(১৬.৪)	২২০	(২২০)
নাস্তিক ব্যক্তি	৪.৫	(৪.৪)	১৩০	(১৩০)

করবে, যদি তার প্রভুই তাকে বিয়ে দিয়ে থাকেন তবে তার সন্তানাদি ও স্ত্রীও ঐ প্রভুরই সম্পত্তি হবে', ইত্যাদি।

ধর্মের নানা প্রাসঙ্গিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিনিষেধ ও সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে মিশিয়ে এভাবে শাসকশ্রেণীর প্রতিভূরা শাসিত দাস ও নারীদের অধীনস্থ করতে থাকে। নব্য-প্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে, খ্রীস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর এবং তার পরবর্তী আরো কয়েক-শ' বছর ধরে সমাজ তথা ধর্মের এই রূপান্তর দ্রুত সংঘটিত হতে থাকে এবং লিখিত ধর্মশাস্ত্রাদিতে তার প্রকাশ পেতে থাকে। ধর্মের এই ব্যবহার ও এই রূপ এখনো টিকে আছে—আরো জটিল, সূক্ষ্ম, শক্তিশালী হয়ে। দীর্ঘদিনের আরোপিত বিশ্বাসের ফলে, শাসক-শোষিত সব ধরনের মানুষই এগুলিকে ধ্রুব সত্য বলেই ধারণা করেছেন। এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে উৎসুক ব্যক্তিরা তাই ধর্মে কোন ধরনের আঘাত পড়লেই তা নিয়ে চরম উন্মাদনা ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

ধর্মের সাংগঠনিক রূপ

মানুষের কল্পনার সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক চাহিদা মিলে পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে সংগঠিত নানা ধর্ম বিকাশ লাভ করতে থাকে—যেগুলি পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত হয়েছে। এ সমস্ত ধর্মেরই আদি উৎস ছিল ঐ সর্বশক্তিমান অতি-প্রাকৃতিক শক্তি তথা ঈশ্বরের কল্পনা, প্রকৃতির রহস্যময়তা ও নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের থেকে আসা অলৌকিক শক্তির কল্পনা। মানুষের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই ধর্মচিন্তা, ছিল ও আছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্কের সঙ্গেও। পরবর্তীকালে এই জ্ঞান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে হয় নি। একইভাবে হয় নি ধর্মীয় চিন্তার বিকাশও। তাই আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসীরা যখন গাছ, সাপ বা কোনো পাথরের টুকরোকে পূজো করছে, তখন ভারতের কিছু মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের মতো জটিল একটি চিন্তাপদ্ধতিতে নিজেদের লিপ্ত করেছে, কিংবা আরব অঞ্চলে মহম্মদ ঈশ্বরের নির্দেশ হিসেবে প্রচার করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন আরব-জাতিকে সুশৃঙ্খল ও মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত করেছেন। আজ এতদিন পরে নতুন-পুরনো মিলিয়ে, নানা নামের এত অজস্র ধর্মমত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে যে, তাদের প্রতিটির জন্মকথা বলা স্বল্প পরিসরে সাধ্যাতীত।

কীভাবে মানুষ এবং একমাত্র সম্বন্ধ মানুষই নানা ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছে তার প্রাথমিক আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। প্রথমে এক্ষেত্রে 'হিন্দুধর্ম' দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, কারণ ভারত নামের যে ভূখণ্ডে আমরা বসবাস করি তাতে এই ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত লোকেরাই সংখ্যাগুরু এবং পৃথিবীতে অন্তত শতকরা ৫ ভাগের বেশি মানুষ যে-সব ধর্মে বিশ্বাস করেন ঐ ধরনের মাত্র চারটি ধর্ম রয়েছে (খ্রীস্ট, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ)—এদের মধ্যে উৎসমূলের প্রাচীনত্ব বিচারে হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম।

হিন্দুধর্ম

অবশ্য এখন যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত তা যে সঠিক কী কী লক্ষণ দেখে বিচার ও আলাদা করা যাবে তা বলা দুরূহ। কোনো মূর্তি পূজা করেন না এমন মানুষও নিজেকে হিন্দু বলেন, কারোর প্রধান আরাধ্য কালী, কারোর বা বিষ্ণু, কারোর শিব, আবার কারোর রাম, হনুমান, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি—তারা সবাই হিন্দু বলেই নিজেদের দাবি করেন। তবু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-য় হিন্দুদের সাধারণ কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আত্মন্ ও ব্রহ্মণের তত্ত্বে বিশ্বাস, খ. ইষ্টদেবতা ও ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাস, গ. বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস, ঘ. পুনর্জন্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস।

অবশ্যি আইন অনুযায়ী কেউ এসব বিশ্বাস ও অনুসরণ না করলেও সে হিন্দু হতে পারে—বরং বলা ভাল আইনের প্যাঁচে পড়ে সে হিন্দু হতে বাধ্য হবে। অথচ হিন্দু বাবা-মায়ের বহু সন্তানই আছেন যাঁরা হিন্দুধর্ম কেন, প্রচলিত অর্থের কোন ধর্মেই বিশ্বাস করেন না।

গণতান্ত্রিক অধিকারের বিচারে যে কেউ কোন বিশেষ ধর্ম—তা মনগড়া বা মিথ্যা হলেও—তাতে বিশ্বাস করতে পারেন এবং ঐ অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারেন। অন্যদিকে কোন ধর্মে বিশ্বাস না করা এবং এই ধরনের কোন ধর্মাবলম্বী বলে নিজেকে পরিচিত না করানোর গণতান্ত্রিক অধিকারও সবার আছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী অবিশ্বাসীদের জন্য এই গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। তবে আইনটি আপাতত কেরলেই সীমাবদ্ধ। অষ্টম কেরালা বিধানসভায় ১৭৬ নং বিল—ত্রিবাংকুর-কোচিন হিন্দু ধর্মীয় স্থান (তৃতীয় সংশোধনী)

"যে জন্মসূত্রে হিন্দু (অর্থাৎ তার বাবা-মা হিন্দু), অথবা যে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করে বা ধর্মান্তরিত হয়েছে,—সে-ই হিন্দু,—সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক বা না করুক, মন্দিরে পুজোয় বিশ্বাস করুক বা না করুক।" ("Hindu' means a person who is a Hindu by birth, or by conversion into Hindu religion or who professes the Hindu religion—whether or not such persion believes in God and temple worship.")

স্পষ্টত নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতা—এ সবের দাম এই আইনে নেই ; হিন্দু পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস অনুযায়ীই তার পরিচয়-নির্ধারিত—হিন্দু দম্পতির সন্তানের হিন্দু (বা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত) না হয়ে, শুধু 'মানুষ' হওয়ার অধিকার নেই।

তথাকথিত হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্য ও লক্ষণাদির বিভিন্নতাও উল্লেখযোগ্য। অন্য প্রায় কোন ধর্মেই এমন পরস্পরবিরোধি আচার অনুষ্ঠান ও কথাবার্তা দেখা যায় না। অনেকে একে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও সহিষ্ণুতা, এবং পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সনাতনত্বের মিশ্রণ ইত্যাদি গালভরা নাম দেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ঘটেছে, কোন একক ব্যক্তি-নেতৃত্ব থেকে হিন্দুধর্ম সৃষ্টি না হওয়ার কারণে। (খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মের উৎসমূলে এই একক নেতৃত্বের ব্যাপারটি ছিল—যদিও পরিবর্তীকালে এদের মধ্যেও নানা ধরনের বৈচিত্র্য, বিভেদ ও বিভিন্নতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।) সৃষ্টি থেকেই বহুজনের বহু রচনা, মহু মতামত, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি এই হিন্দু ধর্মে স্থান পেয়েছে।

অনেকের মতে সম্ভবত ১৮৩০ সালে ইংরেজরা প্রথম 'হিন্দু' এই কথাটির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষের পরিচয় দিতে শুরু করে, এবং বিগত ২০০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতাকে এই নামে অভিহিত করা শুরু করে। এই সভ্যতার মূল উৎস বৈদিক সভ্যতা। হিন্দু শব্দটিও এসেছে সিন্ধু নদীর নাম থেকে—সিন্ধু নদীর তীরবর্তী সভ্যতা তথা মনুষ্যগোষ্ঠীর নাম হিসেবে। তবে হিন্দু এই কথাটির উৎস হিসেবে ফার্সি 'হিন্দু' কথাটিরও উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন মুসলিম আরবী ও ফার্শী সাহিত্যে 'সিন্দ, হিন্দ' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানের আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ 'সিন্দ দেশ' নামে এবং তার পূর্বদিকের অঞ্চলকে অর্থাৎ বর্তমান ভারত ভূখণ্ডকে 'হিন্দ দেশ' নামে অভিহিত করা হতো।

'হিন্দু' নামকরণটির উৎস যাই হোক না কেন, এটি স্পষ্ট যে বেদে বা উপনিষদে, কিংবা কোনো 'দেবতা'র বা মুনিঋষির মুখ থেকে হিন্দু নামকরণটি হয়নি। হিন্দু হিসেবে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা তাঁদের এই নামটি পেয়েছেন বিদেশীদের কাছ থেকে।

এখনকার হিন্দুধর্ম সুনির্দিষ্ট তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে—বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য এবং সবশেষে হিন্দু। ভারতীয় ভূখণ্ডেই মূলত এর বিকাশ—আরবে যেমন ইসলাম, ইউরোপে খ্রীস্ট, চীনে তাও ইত্যাদি। বৈদিক সভ্যতার শুরুও তখনকার বিচারে বহিরাগতদের দ্বারা, যারা পরবর্তীকালে 'আর্য' নামে পরিচিত হন; প্রায় ২000—১500 খ্রীস্টপূর্বাব্দে মধ্য এশিয়ার পারস্য (ইরানীয়) অঞ্চলের এক যাযাবর মনুষ্যগোষ্ঠী ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেন, তাঁরাই এই নামে পরিচিত। (আরেক গোষ্ঠী যায় ইউরোপীয় অঞ্চলে)।*

---

* ইরাণীয় অঞ্চল থেকে যাঁরা ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসেছিলেন তাঁরা একটি বিশেষ মনুষ্যগোষ্ঠীই—কিন্তু তাঁদের 'আর্যজাতি' নামে অভিহিত করা যথার্থ নয়। ঐ সময় প্রকৃতপক্ষ 'আর্য' নামে আদৌ কোন জাতি যথাসম্ভব ছিলই না, এটি একটি ভাষা গোষ্ঠীর নাম। সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রীক—প্রধানত এ তিনটিই আর্যভাষা। ল্যাটিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, রুমানিয়ান ইত্যাদি ভাষা। টিউটনিক (ইংরাজী, জার্মান, সুইডিস ইত্যাদি) ও স্লাভিক (রাশিয়ান, পোলিশ ইত্যাদি)—এ দুটি গোষ্ঠী আর্যভাষা গোষ্ঠীর উপবিভাগ। অন্যদিকে এশিয় অঞ্চলে সংস্কৃত থেকে প্রথমে পালি (বা মাগধি) ও কিছু প্রাকৃত ভাষা এবং পরে এদের থেকে হিন্দী, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী, ইত্যাদি ভাষার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে যেমন তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, টুলু ইত্যাদি ভাষা অনার্য বা আর্য-সম্পর্ক রহিত,— তেমনি হিব্রু, আরবি, ফিনিশ, হাঙ্গেরিয়ান, বাস্ক (Basque) ইত্যাদি ভাষা সহ চীনা, জাপানী, তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি ভাষাও অনার্য। 'আর্য' কথাটিকে জাতি হিসেবে ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা পরবর্তীকালে বিকৃতি হিসেবে ও উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে সৃষ্টি হ'য়েছে। হিটলার ও তার অনুগামীসহ ইযোরোপের কিছু গোষ্ঠী যেমন এই কাজ করেছে, তেমনি ভারতীয় অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিও উগ্র জাত্যাভিমানে ভুগে এমন ধারনার প্রচার করেছেন। বৈদিক তথা সংস্কৃত সাহিত্যে 'আর্য' বলতে সম্মানিত ব্যক্তিকে বোঝানো হত (sir বা মহাশয়); মূল সংস্কৃতে এর অর্থ জন্ম স্বাধীন (free-born) বা সদাশয় ব্যক্তি।

তবে যাই-ই হোক না কেন, ভারতের বর্তমান হিন্দুদের পূর্বপুরুষ আর্যভাষীরা যে ইরাণীয় অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তা মোটামুটি নিশ্চিত। (অবশ্য কেউ কেউ এব্যাপারে কিছু ভিন্ন মতও পোষণ করেন।) 'ইরান' (অন্যনাম 'পারস্য') কথাটিই আসছে 'আর্যনাম' অর্থাৎ

তখন নব্যপ্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গেছে, ব্রোঞ্জ ও লোহ যুগের বিকাশ ঘটছে। বাড়ছে জনসংখ্যা ও চাহিদা, উন্নত হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি। এসবেরই ফলশ্রুতিতে অথবা স্থানীয় অঞ্চলে অন্তর্বিরোধের ফলে, একটি গোষ্ঠী সুবিধাজনক নতুন জনপদ স্থাপনের জন্য পরিভ্রমণ করতে করতে ভারতীয় অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে। এরা সঙ্গে আনে পোষমানা ঘোড়া, রথ ও সুললিত ভাষা যা বৈদিক ভাষা বা আদি সংস্কৃত নামে পরিচিত। এসব-গুলিই এ-অঞ্চলের আদি বসবাসকারী মানুষদের কাছে অপরিচিত ছিল। শুরুতে এই ভাষায় রচিত সাহিত্য ছিল মৌখিক অর্থাৎ শ্রুতি। খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০-১২০০ সাল নাগাদ সম্ভবত বর্তমান পাঞ্জাব অঞ্চলের ঘটনাবলী নিয়ে এগুলি সুসংহত ও লিখিত হয়ে আদি বেদ, ঋগ্বেদের জন্ম দেয়। ঋগ্বেদে 'আর্য'-দের উল্লেখ আছে, যাদের দেবতা ছিল সাদা (কিন্তু নিজেরা নয়—অন্তত ইয়োরোপীয়দের মতো) এবং উল্লেখ আছে দাস বা দস্যুদের—যারা ছিল কৃষ্ণকায়, অনাশা, অব্রাহ্মণ, অ-দেবায়ু, অ-ব্রত ইত্যাদি। স্পষ্টতই এই শেষোক্ত দলটি ছিল ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা, যাদের রঙ ছিল কালো। অবশ্যই এদেরও ছিল নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস (প্রায়শই ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী অর্থাৎ নব্যপ্রস্তযুগীয়), আচার-অনুষ্ঠান। কিন্তু ধাতু ও ঘোড়ার ব্যবহারকারী, 'শিক্ষিত' রথারোহী যোদ্ধা-যাযাবর (পরবর্তীতে কৃষিজীবী) সংখ্যালঘু তথাকথিত আর্যগোষ্ঠীর কাছে এরা পরাজিত হয় এবং আর্য ভাষীদের সভ্যতাই প্রাধান্য লাভ করে; প্রতিষ্ঠিত হয় বৈদিক ধর্ম। (তবে এই অনার্য আদিবাসীদের সভ্যতাও অনুন্নত ছিল না। ঋগ্বেদেই

আর্যদের দেশ) শব্দ থেকে। মূল আর্যভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই যাযাবরবৃত্তি করতে করতে নানা এলাকায় এড়িয়ে যায়।

আরেকটি দিকও যা নিশ্চিত তা হল, 'আর্য' কথাটি ভারতীয় হিন্দুদের একচেটিয়া নয়, বরং তাঁদের বাইরে এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই বেশি সংখ্যায় আছেন। সংস্কৃতকে দেবভাষা হিসেবে কল্পনাও নিছকই কল্পনা এবং নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল।

সব মিলিয়ে 'আর্যজাতি' নামে কোন জাতি ছিল না। এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর "ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "আর্য নামক ধারনাটির সত্যই কোন সার্থকতা ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেই।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন আর্যভাষী। কিন্তু ব্যাপকভাবে ভুল প্রয়োগের ফলে আর্য, আর্যজাতি, আর্যভাষী—সব একাকার হয়ে গেছে।

তাদের নগরী আব্‌তপুর-এর উল্লেখ আছে। 'দাস' কথাটিও ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় আদিতে ছিল 'শত্রু'-র সমার্থক—পরবর্তীতে পরাজিত শত্রুদের সম্পর্কে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।)

বৈদিক ধর্মের আগে ভারতীয় অঞ্চলের শক্তিশালী ধর্মবিশ্বাস ছিল মোঅনজোদড়ো-হরপ্পা অঞ্চলের অধিবাসীদেরও। কিন্তু আর্যদের শক্তি ও সংস্কৃতি এসব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। তারা ক্রমশ শাসকগোষ্ঠী যেমন হয়, তেমনি এতদ্‌অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে মিলে-মিশেও যায়—ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও যে সংমিশ্রণ ধীরে ধীরে ঘটেছে। সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি (২৮০০-১৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) আর্যদের দৈনন্দিন জীবন ও ধর্মাচরণে উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলে। সিন্ধু সভ্যতায় দেবীপূজা ও ষাঁড়ের ধর্মীয় প্রতীকী রূপ বহুল প্রচলিত ছিল। সম্ভবত তিনমাথা ওয়ালা এক দেবতার আরাধনাও করা হত। এ সবগুলিও পরবর্তীকালে বৈদিক তথা হিন্দুধর্মে সামান্য পরিবর্তিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতিতে কোন মন্দিরের অস্তিত্ব যথা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মাচরণের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সাধারণের যৌথ স্নানের ঘর ছিল—পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে যা স্নানের ঘাটে রূপান্তরিত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার প্রায় প্রতি বাড়ীতে ছিল বাথরুম বা স্নান ঘর। এ ধরনের কিছু চিহ্ন দেখে অনুমান করা হয়—স্বাস্থ্যের কারণের চেয়েও—শরীরকে পরিষ্কার করাটা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা তথা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। হিন্দুধর্মেও এটি গভীরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতিতে মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া হত—যা অবশ্যি হিন্দুরা অনুসরণ করেন নি। তবে গুজরাটের একটি হরপ্পা-এলাকায় এক সঙ্গে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে কবর দেওয়া হয়েছে বলে দেখা গেছে। এসব থেকে অনুমান করা হয় হিন্দুধর্মের (?) সতীপ্রথার পূর্বতন রূপ সিন্ধু-সভ্যতায় সামান্য হলেও ছিল। এছাড়া বৈদিক ধর্ম বা সভ্যতার পূর্বসূরী ঐ সভ্যতায় পবিত্র প্রাণী, পবিত্রগাছ (যেমন অশ্বত্থ), ছোট ছোট মূর্তিপূজা ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল—এগুলিও পরবর্তীকালে বাতিল করা হয় নি। অবশ্যি ভারতীয় ভূখণ্ডের বা পৃথিবীর প্রায় সব এলাকাতেই কম-বেশি এসব ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

আর শুধু সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব নয়, বেদরচয়িতারা যে ইরানীয় অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, ঐ ইরানীয় অঞ্চলের প্রাচীন

ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের রেশও আর্যদের ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিতে লক্ষ্য করা যায়। ইরানীয় অঞ্চলের জোরোঅ্যাস্ট্রিয়ানদের মধ্যে গলা দিয়ে সুতো গলিয়ে বা বেঁধে একটি শিশুর ধর্মীয় উত্তরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুধর্মে এই সুতো পৈতে হিসেবে ও ঐ পদ্ধতি উপনয়ন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। জোরোঅ্যাস্ট্রিয়ানদের দেবতা আহুরা মাজদা-র সঙ্গে বৈদিক দেবতা বরুণের সাদৃশ্য প্রকট। বেদবর্ণিত সোমরস ও জোরোঅ্যাস্ট্রিয়ানদের 'হোঅম' প্রায় অভিন্ন।

ইরানীয় অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের একটি দল ইয়োরোপে যায়। ইয়োরোপীয় অঞ্চলের কিছু প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেও ভারতীয় 'আর্য' তথা হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের মিল লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের সময় অগ্নি সাক্ষী রাখা তথা আগুনের চারপাশে ঘোরা, মৃত্যুর পর শবদাহ পদ্ধতি এবং

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শতকরা হিসাব

পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৩'৩ ভাগ লোক তথাকথিত হিন্দু-ধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত। এঁরা ছড়িয়ে আছেন ৮৮টি দেশে। কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ হিন্দু তা এখানে উল্লেখ করা হল।

দেশ	জনসংখ্যার % ভাগ	দেশ	জনসংখ্যার % ভাগ
নেপাল	৮৯'৫	বাংলাদেশ	১২'১
ভারত	৮২'৬৪	মালয়েশিয়া	৭'০
মরিশাস	৫২'৫	দক্ষিণ-আফ্রিকা	২'১
গুয়ানা	৩৪ ৪	ইন্দোনেশিয়া	১'৯
সুরিনাম	২৭'৪	পাকিস্তান	১'৫
ত্রিনিদাদ-টোবাগো	২৪'৯	ইংল্যাণ্ড	০.৭
ভুটান	১৪'৬	কানাডা	০'৩
শ্রীলঙ্কা	১৫ ৫	আমেরিকা	০'২
ওমান	১৩'০		ইত্যাদি

এদের মধ্যে নেপালের সরকারী ধর্ম হিন্দুধর্ম, ওমান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া সরকারিভাবে ইসলাম ধর্মের দেশ, ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ধর্ম একেশ্বরবাদ এবং ভুটানের সরকারি ধর্ম মহাযান বৌদ্ধ। বাকিগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

পূর্বপুরুষদের 'শান্তির' জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান বা আকাশের দেবতা হিসেবে এক 'দেবতা' (পুরুষ)-কে পূজো করা ইত্যাদি ধরনের নানা সাদৃশ্যই রয়েছে। যার অর্থ এসবের উৎস একই।

এছাড়া পরবর্তীকালে স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী ও অন্যান্য নানা অঞ্চলের নানা মনুষ্যগোষ্ঠী, বিভিন্ন বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করে—বা শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, সব ধর্মের ক্ষেত্রেই কম বেশি সত্যি এবং এসব অনুষ্ঠান যে কৃত্রিম, আরোপিত ও মনুষ্যসৃষ্ট তা এই ধরনের সংযোজন-বিয়োজন থেকেও বোঝা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলে আসার পর, এখান থেকে আহরিত, এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিকশিত বিশ্বাস, বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন ধর্মাচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কালী বা শিবলিঙ্গের পুজো, পাথরের টুকরো বা গাছকে দেব-দেবী হিসেবে কল্পনা করা, ইত্যাদি এতদ্‌অঞ্চলের আদিবাসীদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে আর্যদের মধ্যেকার সুদক্ষ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নতুনতর তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, যেমন ব্রহ্মের তথা ঔপনিষদিক ধারণাবলী।

আর্যরা প্রথমে আসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, তাদের মধ্যেকার সুদক্ষ-যোদ্ধা ও নেতারা রাজা বা গোষ্ঠীপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়; এরা পরবর্তীকালে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ঋগ্‌বেদ ও পরবর্তীকালে রচিত অন্যান্য বেদের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ও এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য, কল্পিত দেবদেবীর কাছে কাকুতি মিনতি, দেবদেবীর কাছে সোনা দানা ও সুন্দরী নারী থেকে শুরু করে গরু-ঘোড়া অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। আর আছে নানা রোগকষ্ট, বিপদ আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করার উপর বিশ্বাস। কল্পিত রাক্ষসদের বিনাশ করা থেকে গলায় ব্রণ হলে তার চিকিৎসা, কুষ্ঠ-যক্ষ্মা-জণ্ডিস সারানো থেকে শুরু করে 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের ক্রোধ অপনয়ন' অব্দি, কিংবা সাপ-বিছা কামড়ানোর চিকিৎসা থেকে 'ভার্যার সহমরণের ঐচ্ছিক প্রবৃত্তি ও নিষেধ মন্ত্রাদি' পর্যন্ত—অজস্র কারণের জন্য বৈদিক মন্ত্র লেখা আছে। যে হিন্দুরা বেদকে সনাতন, অভ্রান্ত ইত্যাদি হিসেবে বিশ্বাস করেন তাঁরাও কেউ আজকাল এভাবে বেদকে অনুসরণ করেন না—হিন্দু সংগঠনের নেতা

থেকে শুরু করে 'ক্যাডার' অব্দি প্রায় সবাই-ই। অর্থাৎ এঁরা বেদে আস্থা না রেখে বা বেদবিরোধী হয়েও, বেদে বিশ্বাসী।

চারটি বেদ কোনো এক জনের দ্বারা স্বল্প সময়কালে রচিত হয় নি। বৈদিক বিশ্বাস ও নীতিমালা বহু শতাব্দী ধরে বহু জনের দ্বারা রচিত, পরিমার্জিত ও সংকলিত হয়ে একটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। সমস্ত বেদ ও পরবর্তীকালের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের রচনা ও সংকলন সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যায়। নিছক কল্পনা ও পূজা-প্রার্থনা-কাকুতি-মিনতিই নয়, বেদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞান-চর্চারও আভাস পাওয়া যায়। দশমিক গণনা পদ্ধতি, ভগ্নাংশ, পাটীগণিত-বীজগণিত-জ্যামিতির নানাবিধ সূত্র ইত্যাদির আবিষ্কার ও উন্নতির পরিচয় বেদ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণে উল্লেখযোগ্য ভাবে রয়েছে। জ্যোতিষ বেদাঙ্গ, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যার বইও লেখা হয়। কিন্তু এ-জাতীয় নানা বিজ্ঞান-চর্চার আকাশ ঢেকে ছিল আধ্যাত্মিকতা ও কল্পনার ধোঁয়ায়—তাই বেদ-সংহিতা-ব্রাহ্মণ বললে সাধারণভাবে কখনোই বৈদিক যুগের বিজ্ঞান-চর্চার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। পরে একই ভাবে আয়ুর্বেদের নানা বস্তুবাদী চিন্তা:কও হতমান করা হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ১000 সাল নাগাদ আর্যদেব দ্বারা সিন্ধু ও গঙ্গার বিশাল উপত্যকা অঞ্চলে (উত্তর ভারত ও উত্তরপশ্চিম ভারত) ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাজা ও পুরোহিত গোষ্ঠী শাসকশ্রেণী হিসেবে সুসংহত হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যক অনুগত প্রজা বা দাসেদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করার জন্য ক্রমশ অনুভব করা যায় যে, বৈদিক তত্ত্বাবলী অসার হয়ে উঠছে। শাসক ও শাসিতের সংঘাত এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার সংঘাত তথা রাজায় রাজায় ক্ষমতার লড়াই দেখা দিতে থাকে। এ সময় ধর্মের আবরণে এমন একটি তত্ত্বের প্রয়োজন হয়, যা চমকপ্রদ ও নতুন। আবিষ্কৃত হয় ব্রহ্মতত্ত্ব, রচিত হয় উপনিষদের শ্লোকগুলি। আর্যরা এ-দেশে আসার আগে এখানে ছিল অজস্র দেবতা (এক জায়গায় উল্লেখ আছে ৩,৩৯৯টি দেবতা ছিল—তবে এরা ছিল প্রায়ই লৌলিক, পারিবারিক বা সীমাবদ্ধ 'ক্ষমতার' দেবতা)। বেদেও ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, পূষণ, মিত্র, বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নামের দেবতায় বিশ্বাসের কথা প্রচার করা হয়। কিন্তু এসবে যখন আর কাজ হল না, তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, নৈর্ব্যক্তিক, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, অজর অমর ইত্যাদি

গুণাবলী সম্বলিত ব্রহ্মের ধারণা প্রচার করা হয়। আগের দেবদেবী অনেকটাই ছিল যেন মানুষই—ইন্দ্ররা মদ খেত, রেগে যেত, সুন্দরী মেয়ের পেছনে ছুটত, শক্তিশালী শত্রুরা তাদের হারিয়ে দিয়ে বেইজ্জত ও নাজেহাল করত—ইত্যাদি নানা মানবিক দিকের কথা বেদে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধর্ম তথা দেবতার এ ধরনের ছবি সাধারণ মানুষকে আর ভুলিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে অনুভব করা গেল। শাসকদের দ্বারা (অনেকের মতে রাজা প্রবাহণের দ্বারা) ব্রহ্মের যে ধারণা প্রচার করা হলো তা মানুষকে ভুলিয়ে রাখার পক্ষে উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলো। এই ব্রহ্ম নিরাকার, দুর্জ্ঞেয়। সারাজীবন 'সাধনা' করেও তাকে জানা প্রকৃতই অসম্ভব—তবু ঐ লোভই দেখানো হল। মূলত এই তত্ত্বকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রচার করার জন্য সৃষ্টি হলো অতি উন্নত মানের, সুললিত, সুখশ্রাবী অসাধারণ সাহিত্য, উপনিষদ। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই এই উপনিষদের রচনা ও সংকলন শেষ হয়।

মোটামুটি এই সময়কালে (খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম বা পঞ্চম শতাব্দী ও তারপরে) বৈদিক ধর্মের আরেকটি যে বিপুল রূপান্তর ঘটে তা হলো বর্ণভেদ প্রথার সৃষ্টি। আদি বেদে তার সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ নেই, পরবর্তীকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কিছু উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে শাসক-শ্রেণীর প্রয়োজনেই ধর্মের নাম করে, ঈশ্বর এইভাবে সৃষ্টি করেছেন—একথা প্রচার করে, এবং একই সঙ্গে কর্মবিভাজনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতোমধ্যেই ঈশ্বর-অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে সুদৃঢ় হয়ে গেছে। ঐ ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিনিধি হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও ভীতিপ্রদ, সর্বাপেক্ষা সুবিধাভোগী ও শিক্ষিত বা মেধাসম্পন্ন গোষ্ঠী—ব্রাহ্মণ। এরই ঘনিষ্ঠতম সহায়ক হলো যোদ্ধাগোষ্ঠী তথা ক্ষত্রিয়, আর এদের সহযোগী হলো বৈশ্য (জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, গোপালক)। এবং এদের সবার অনুগত, দাসানুদাস হলো শূদ্র শ্রেণী—সংখ্যায় যারা বিপুল। গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের শ্রমের দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন না হলে তখনকার ঐ সমাজের পক্ষে ঐভাবে টিকে থাকা সম্ভবও ছিল না। এর ফলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের বিপুল সংখ্যায় ক্রীতদাস রাখার দরকার হল না। দাসপ্রথা পুরোপুরি চালু না করেই, বর্ণভেদকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে একই উদ্দেশ্য সফল করা হল—সামাজিক ও ব্যক্তিগত উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি

করা গেল। পূর্ববর্তী তিনটি বর্ণকে বলা হলো দ্বিজ, শ্রেষ্ঠতর। শ্রেষ্ঠতম অবশ্যই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্কে কী বুদ্ধি ছিল আর হাতে কী অসীম ক্ষমতা ছিল—তার প্রমাণ ঐ সময়কার সমস্ত সাহিত্যেই ভালোভাবে রয়েছে। এই পুরোহিত শ্রেণী যে পুঁথিপত্র লিখল, তাতে নিজেরাই নির্লজ্জভাবে জানাল 'রাজার পক্ষে পুরোহিতের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজনীয়, এমনকি দেবতাদের পক্ষেও ঠিক পথে চলার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন।' (তৈত্তেরীয় সংহিতা ২।৫।১।১, ৫।১।১০।৩) 'পুরোহিত ক্ষত্রিয়ের অর্ধ আত্মা, কেননা পুরোহিতবিহীন রাজার অন্ন দেবতারা গ্রহণ করেন না।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৮।৪, ৪০।১) ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের হয়েই রাজ্য শাসন করবে—এরকমই ব্যাপার। শূদ্রদের তো বটেই, বৈশ্যদের সম্পর্কেও বলা হল, 'মানুষদের মধ্যে বৈশ্য ও পশুদের মধ্যে গরু ভোগের সামগ্রী।' (তৈত্তেরীয় সংহিতা; ৭।১।১।৫) বৈশ্যরা অপরকে (অর্থাৎ সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে) করপ্রদান করে ও খাদ্য জোগায়। (শতপথ ব্রাহ্মণ; ৪।৩।৩।১০) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করলেও, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নৈতিক মান ও শৃঙ্খলা রক্ষার কথাও বলা হয়। ত্যাগ স্বীকার করা, অধ্যয়ন করা, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ না করা—এসবের কথা জোর দিয়েই বলা হয়। কিন্তু এসব কথা তখনি বলা হয়, যখন তাদের শাসক গোষ্ঠী হিসেবে অবস্থান অতি সুরক্ষিত করা হয়ে গেছে। পাশাপাশি এই অবস্থান সুরক্ষার স্বার্থেও এমন সংযত, অনুচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন প্রয়োজন ছিল। এই চতুর্বর্ণপ্রথার বিধিনিষেধ· নিয়মকানুন অর্থাৎ তখনকার সমাজ ব্যবস্থার, শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী সংবিধানের সংকলিত রূপ ছিল মনুসংহিতা। এর সৃষ্টি হয় আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে—যদিও ক্রমশ সংকলিত ও লিখিত আকার পায় আরো পরে (পি ভি কানে তাঁর History of Dharmasastra-এ এই সময়কালকে খ্রীস্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।)

খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী সময়কাল থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিতিও বিনষ্ট হতে থাকে। যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। ছোট ছোট জন-গোষ্ঠী তার স্বাধীন অস্তিত্ব হারাতে থাকে—বড় বড় রাজ্য তাদের অধিকার করে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'মাৎস্য ন্যায়',

যখন শক্তিশালীরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলছে—যেন বড় মাছ গিলে ফিলছে ছোট মাছেদের। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা বাড়ছে—মূলত গঙ্গাদিয়ে বাণিজ্যের প্রসার ঘটার ফলে। এই ধরনের ক্রমবর্ধমান সামাজিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা, কিছু মানুষের মধ্যে সমাজ ত্যাগ করে বিচ্ছিন্নভাবে তথাকথিত আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের মানসিকতার সৃষ্টি করে।

এই মানসিকতা, বৈদিক অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়। ফলে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী সময়কালে সমাজের বিপুল সংখ্যক অগ্রণী সক্ষম ব্যক্তি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়াকে মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করছেন।

ব্যাপকভাবে এই সন্ন্যাস নেওয়ার (asceticism) প্রবণতা ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সামাজিকভাবে শূণ্যতা সৃষ্টি হতে থাকে। বেদ সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট করা ছিল। সন্ন্যাসের ব্যাপকতা এদের মধ্যেই শুরু হয়—সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। এর ফলে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই এই শূন্যতা বিশেষ করে অনুভূত হতে থাকে। আর একে আটকাতে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা উচ্চশ্রেণীর মানুষ তথা দ্বিজদের জন্য নতুন এক ধরনের প্রথার জন্ম দেন—যা চতুরাশ্রম হিসেবে পরিচিত। জীবনের চারটি ভাগের কথা প্রচার করা হয়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এ ধরনের শৃঙ্খলার ফলে, শুধুমাত্র বৃদ্ধ তথা অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হল। হয়তো সবাই তা মানেননি, কিন্তু এই চতুরাশ্রমের সমর্থনে নানা ব্যাখ্যামূলক কথাবার্তা চালু হল এবং যুবক, তরুণ বা সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ন্যাসের প্রবণতা অনেকটা আটকানো গেল। বর্ণভেদ ও চতুরাশ্রম—উভয়ে মিলে হিন্দু ধর্মের মূল্যবান, অবিচ্ছেদ্য বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি হল।

এবং বেদ পরবর্তী হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্য অধ্যায়েরও সূচনা হলো যার উন্মেষ ঘটেছিল সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পর্যায়ে। মূলত নিজেদের রচনা করা এই সব সংবিধানিক নিয়মাবলীতে ব্রাহ্মণরা নিজেদের চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী করে তুলল। ক্ষত্রিয় তথা রাজারা দেখল এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার ধ্বজাবাহী, ধোঁয়াটে ধর্মতত্ত্ব প্রচারকারী গোষ্ঠী ছাড়া বিপুল সংখ্যক প্রজাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রজাদের মস্তিষ্ককে আধ্যাত্মিক নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখে ক্ষত্রিয়রা সহজেই করতে পারল রাজ্য শাসন। বর্ণভেদ প্রথায় এ অন্যস

কাজের দায়িত্ব পেল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ। অনুগত অন্যরা এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে নারীরাও অলৌকিক শক্তির অনুগ্রহ লাভের জন্য ক্রিয়াকর্ম করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো।

কিন্তু ব্রাহ্মণরা যতই হাজারো নিয়মকানুন করে নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করতে থাকল, তার আংশিক প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ, অসন্তোষ, অবিশ্বাসও সৃষ্টি হতে থাকল। এর আঁচ পেয়ে উন্নত মেধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণরা আরেকটি তত্ত্ব 'আবিষ্কার' করল যা হলো কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব। বেদে আত্মার ধারণা ছিল, কিন্তু তা সুসংহত ছিল না। জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব বেদে একেবারেই ছিল না। ভারতের আদিবাসী দ্রাবিড় ও মুণ্ডাদের মধ্যে টোটেম ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ-জাতীয় কিছু চিন্তার আভাস ছিল। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের ব্রাহ্মণ্যপর্বে এই যে-তত্ত্বের অবতারণা করা হলো তা সম্পূর্ণ চতুর্বর্ণ-প্রথার পরিপূরক হিসেবে ও তাকে শক্তিশালী করার জন্য। (অনেকের মতে এই কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের অপতত্ত্বটি যাজ্ঞবল্ক্যের মস্তিষ্ক-প্রসূত।) সমগ্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজ এই তত্ত্বকে লুফে নিল। কল্পিত-অজ্ঞাত পূর্বজন্মে খারাপ কাজ বা 'পাপ' করা হয়েছিল বলেই জীবনের দুর্দশা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ইত্যাদি, এসবের পেছনে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় তথা শাসকশ্রেণীর কিছু করার নেই,—এ ধরনের চিন্তা যদি আপামর জনসাধারণের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায়, তাহলে রাজার অস্তিত্ব আর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অতি সুনিশ্চিত হবে এতে আর আশ্চর্য কী! একইভাবে জীবনে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, হতদরিদ্র হয়েও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তথা প্রভুর অক্লান্ত সেবা করলে ও তাদের দান-খয়রাত করলে, চরম ত্যাগ স্বীকার করলে, মৃত্যু পরবর্তী পরজন্মে অতীব সুখে দিনাতিপাত করা যাবে—এ ধরনের আশা যদি মানুষের মনে জাগিয়ে রাখা যায়, তবে জীবনের নানা দুর্দশা ভুলে থাকার পক্ষে তা বিরাট ফলপ্রসূ। বর্ণভেদ প্রথার সফল বিকাশের পক্ষে এই চরম মিথ্যাচার ও প্রতারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে হিন্দুধর্মের।

কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা থেমে নেই। যদিও তুলনায় অনেক কম ও আশানুরূপ নয়, তবু এ সময়কালেই ভারতীয় অঞ্চলে চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থ-রসায়ন বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার কিছু বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু

ব্রাহ্মণদের স্বার্থবিরোধী ছিল এই প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা। তাই এগুলিকেও ধর্মের নাম করে বিকৃত করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের সঙ্গে ধর্মীয় তত্ত্বাবলী মেশাতে বাধ্য করা হয়েছে, জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে কর্মফল ও অলৌকিকত্ব মিশিয়ে জ্যোতিষবিদ্যার মতো অপবিজ্ঞানের জন্ম দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণরা (এবং এখনকার হিন্দুরা) বেদকে শিরোধার্য করে সামনে রাখলেও, প্রকৃতপক্ষে তাকে মাথায় তুলেই রাখা হয়েছে—চোখে দেখা হয় নি। চতুর্বর্ণ, কর্মফল, পুনর্জন্ম—এ সবের কোনোটিই বেদে ছিল না, বেদের বহু শ্লোকও আর অনুসরণ করার দরকার হয় না। দার্শনিক উপলব্ধির মতো গালভরা নাম দিয়ে, অলস মস্তিষ্কগুলি তাত্ত্বিক বিতর্ক আর কাল্পনিক তথ্যাবলীকে নিয়ে গুরুগম্ভীরভাবে সময় কাটাতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত চর্চার চেয়ে এ ধরণের নিষ্ফল 'গবেষণা'র মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিকশিত হয় নানা তত্ত্ব -যেমন. বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক।

পরবর্তীকালে এ ধরনের বিভাজন ও মতভেদ আরো হয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামগ্রিক আবিলতা। ব্রাহ্মণদের চূড়ান্ত অনুশাসন ও সীমাহীন ক্ষমতা, শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব এবং জনসাধারণের মধ্যেকার আংশিক বিক্ষোভ ও হতাশা, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করতে থাকে। ফলে আবারো প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুনতর মতাদর্শের—যা তখনকার পরিবেশে নতুনতর ধর্ম ছাড়া কিছুই নয়। এর ফলেই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদী, বিকল্প ধর্মমত—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দী সময়কালে। পরবর্তী কয়েকশত বছর ধরে এই নতুন ধর্মের নবীন নৈতিক ও মানবিক নির্দেশাবলী ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে। মৌর্যদের মত বেশ কিছু রাজাও তাদের গ্রহণ করেন। স্বাভাবিক-ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই সব ধর্মমতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিরোধে লিপ্ত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার নিজের রূপান্তর ঘটাতেও বাধ্য হয়।

সূচনা হলো আধুনিক হিন্দুধর্মের। বেদ পরবর্তী কয়েকশত বছরে ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্মাচরণ মূলত কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। অথচ ব্যাপক মানুষের কাছে, দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে, এগুলি ছিল শান্তিদায়ী ও একান্ত কাম্য। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে যে উদারনীতির কথা প্রচার

করা হলো, তার ফলে একদিকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (বৈশ্য) অন্যদিকে সাধারণ বহু মানুষ দলে দলে আকৃষ্ট হতে থাকল । ফলে একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখা ও বর্ণভেদ প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকেও উদার ও গণতান্ত্রিক হতে হলো। ব্রাহ্মণরা শুধু নয়, সাধারণ মানুষের অবরুদ্ধ আবেগের দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য তাদেরও অনুমতি দেওয়া হলো প্রকাশ্য পুজা, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি করার।

এরই অন্যতম হলো দেবতার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা—ভারতবর্ষে সেই প্রথম, যে মন্দিরে আপামর জনসাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে (যদিও তার মূল নিয়ন্ত্রণ করবে ব্রাহ্মণরাই)। এর আগে ভারতে ঐ অর্থে মন্দির ছিল না—যা ছিল তা হলো বৌদ্ধদের চৈত্য। এর আগে ভারতে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য পর্বে কোন দেবদেবীর মূর্তিও ছিল না। প্রকৃত পক্ষে উত্তর ভারতে অষ্টম শতাব্দীর আগে হিন্দুদের নিজস্ব কোন মন্দিরই ছিল না। পরবর্তীকালে চৈত্যের অনুকরণে, চমক লাগানো স্থাপত্য তৈরি হলো, নাম দেওয়া হলো মন্দির। আর ব্রহ্ম বা নৈর্ব্যক্তিক দেবদেবী নয়, সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া-দেখার মধ্যে নিজেদেরই মতো করে কল্পিত হলো দেবদেবীর মূর্তি, প্রতিষ্ঠা করা হলো ঐ মন্দিরে। নানা জাঁকজমকপূর্ণ নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে, দৃষ্টি-শ্রুতি ও অবেগকে নাড়া দেওয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষ যাতে ঈশ্বর-দেব-দেবী-অলৌকিক শক্তির কাছে সরাসরি 'হাজির' হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হলো। এখনো মাধ্যম থাকল ঐ ব্রাহ্মণরা, কিন্তু আগে যেমন পুজো করার একমাত্র অধিকার ছিল ব্রাহ্মণের, এখন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও পুজো দিতে পারল। ব্রাহ্মণ্য পর্বের এই আংশিক, গণতন্ত্রী-করণই হিন্দু ধর্মের সাম্প্রতিক রূপ—যদিও সময়ে সময়ে আরো বিকশিত বিবর্তিত, পরিবর্তিত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি নানা 'পুরাণ' রচনা, মোটামুটি ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে এগুলি রচিত। বেদে যে কল্পিত উপায়াদির সাহায্যে ঐশ্বরিক শক্তিকে সন্তুষ্ট ও করায়ত্ত করার কথা বলা হয়েছিল, সেগুলি উচ্চবর্ণের মানুষেরা সাধারণ মানুষদের ছুঁতে দিত না—পাছে তারাও ঐ ক্ষমতা পেয়ে যায় (কারণ উচ্চবর্ণের মানুষেরা হয়তো সত্যিই বিশ্বাস করতো ঐ সব বেদমন্ত্রে গরু বাছুর, সম্পদ, অস্ত্র শস্ত্র, ফসল, সুন্দরী নারী, পুত্র ইত্যাদি সব কিছু পাওয়া সম্ভব।) ফলে বেদ সাধারণ মানুষদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরেই রাখা হয়েছিল। তাই শুদ্র বেদ পড়ে বা

শূদ্রনে ফেললে কঠোর শাস্তি থেকে তাকে হত্যা করারও নিয়ম করা হয়েছিল। ধর্মীয় বাতাবরণ ও আনুগত্যের মধ্যে রেখে 'পুরাণ' এই অভাব পূরণ করল। পুরাণ সবাই পড়তে পারে, শুনতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ-দিনের-মানসিক আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ হল।

'পুরাণ' রচনার তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। এর ব্যাপক পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক অনু-শাসনকে সুদৃঢ় ভাবে প্রচার ও প্রোথিত করতে পারল।

এই সময়কালের মধ্যে চতুর্বর্ণপ্রথা যেমন সুদৃঢ় হল, তেমনি জাতিভেদ প্রথাও সুনিশ্চিতভাবে শক্তিশালী সামাজিক স্বীকৃতি পেল। এই জাতিভেদ প্রথা মূলত পেশা ভিত্তিক। এক একটি পরিবার - যে ধরনের শ্রম করত ও উৎপাদন করতে তাদের পুরুষানুক্রমে ঐ কাজ করতে বাধ্য করা হল। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা (অন্তত ঐ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা) কিছুটা রক্ষিত হল বা উত্তরসূরীদের কাজ জোগাড় করে দেওয়ার (অর্থাৎ বেকার সমস্যা দূর করার) ঝামেলা থেকে শাসক গোষ্ঠী বাঁচল। কিন্তু মানুষ হিসেবে বিপুল সংখ্যকের অবনমন ঘটান হল—মানুষের প্রধান পরিচয় ও কর্ম হয়ে দাঁড়াল—তার নিজের ইচ্ছা, রুচি বা যোগ্যতা নয়, তার পূর্ব-পুরুষ কি কাজ করত সেটিই অর্থাৎ জন্মসূত্রেই এক একজনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে দেওয়া হল। এছাড়া বিপুল সংখ্যক মেহনতী মানুষদের মধ্যে বিভেদচিন্তাও ঢোকান গেল—যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কিছু না করে ফেলতে পারে। সামাজিক ভাবে এসবের প্রয়োজন হয়তো হয়েছিল—কিন্তু তা প্রধানত ছিল শাসক গোষ্ঠীর প্রয়োজন-- মূলত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তথা পুরোহিত রাজারাজড়ার প্রয়োজন।

কত দক্ষ ভাবে এ কাজ করা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য জাতি সৃষ্টি করার ও তাদের সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রম করার দায়িত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে। মনুসংহিতা, ধর্ম সূত্র ও পরবর্তীকালের পুরাণ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ ধরনের সামান্য কয়েকটি উদাহরণ হল –

শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয়ানারীর মিলনজাত সন্তানদের বলা হয় চর্মকার,

ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্রা নারীর সন্তান নিষাদ—কাজ শিকার করা ও অরণ্যে নির্বাসিত,

ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা নারীর সন্তান মাহিষ্য—কাজ দেওয়া হল চাষ বাস, চিকিৎসা, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি ;

ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রা নারীর সন্তান—উগ্র ক্ষত্রিয় বা আগুরি—মুখ্য-জীবিকা পশুহত্যা, এছাড়া কৃষি ও পশুপালন ;

উগ্র পুরুষ ও নিষাদ নারীর সন্তান · কুক্কুট, যাদের বৃত্তি অস্ত্র নির্মাণ ;

বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সন্তান—চক্রী, কাজ তেল ব্যবসা ও তেল তৈরী ;

ব্রাহ্মণ ও নিষাদের সন্তান—পৌল্টিক, কাজ পাল্কি বওয়া ;

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান—মন্যু, কাজ চোর ধরা ;

করণ জাতি—লেখক ও হিসাব রক্ষক, এরা বৈশ্য পুরুষ ও শূদ্রা নারীর সন্তান ;

কায়স্থ—মনুস্মৃতির পরবর্তীকালে চিহ্নিত, অত্যাচারী রাজকর্মচারী হিসেবে বিষ্ণুধর্ম সূত্রে উল্লেখিত ; উশনঃ স্মৃতিতে এদের মধ্যে কাকের মত লোভ, যমের নিষ্ঠুরতা ও স্থপতির লুণ্ঠন-ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে এবং কাক-যম-স্থপতির আদ্য অক্ষর নিয়ে কায়স্থ নাম দেওয়া হয়েছে ;

ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য বিচিত্র জাতিভাগ ও দায়িত্ব বিভাজন। সমাজের শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র স্থানীয়, দক্ষ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তি এসব কাজ করেছেন এবং তাকেও ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে চালানো হয়েছে। নিজের কাজের মধ্য দিয়ে, যোগ্যতা দিয়ে এই জন্ম-পরিচয় পাল্টানোর উপায় মানুষের প্রায় রইলই না।

অন্যদিকে মন্দির প্রতিষ্ঠা যেমন হাল আমলের, অর্থাৎ বৈদিক ও তার পরবর্তী কয়েক শত বছরে সেটি যেমন অজ্ঞাত ছিল, তেমনি পুজো করার ক্ষমতার মতো দেবতার চরিত্রেরও গণতন্ত্রীকরণ করা হলো। সৃষ্টি হলো অবতারবাদ। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী তিন-চার শত বছরের মধ্যে (গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে) এই নতুন চিন্তার উন্মেষ তথা কল্পনার বিকাশ ঘটানো হয়। আগে ব্রাহ্মণরা স্বর্গ বা মহাশূন্যে বসবাসকারী যে ঈশ্বর বা দেবদেবীর কথা বলত, এখন তাদের মাঝে মাঝে মানুষের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হলো। বলা হলো, ঐ দেবদেবীও মাঝে মাঝে মানুষের মতো এই মর্ত্যে (পৃথিবীতে) মানুষের ঘরে মানুষ হয়েই জন্মায়—তার মধ্যে ঐশ্বরিক বা দৈবী গুণাবলী থাকে, তাই মানুষ হলেও ঐ বিশেষ মানুষ ঈশ্বর বা দেবদেবীর মতই পূজ্য। এই বিশেষ ব্যক্তির নাম, দেওয়া হল ঐ বিশেষ দেবদেবীর 'অবতার'। বৌদ্ধধর্মের

জাতক কাহিনীর অনুকরণে এই অবতারতত্ত্ব আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর ফলে দেবদেবী একেবারে সাধারণ মানুষের ঘরের কাছেই যেন চলে এল। নির্ভর করার মতো, ভরসা করার মতো, বিপদমুক্ত করার মতো, একজন নিজেরই মতো মানুষ পেয়ে যাওয়ায় ব্যাপক মানুষের কাছে অবতার অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আরো পরে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও এই অবতারত্ব আরোপিত হয়। সব মিলিয়ে বহু অবতার সৃষ্টি হতে থাকে। কখনো বা সম্পূর্ণ কল্পিত হিসেবে, প্রচারিত গল্প গাথার মাধ্যমে; কখনো বা বিশেষ বুদ্ধিমান, ক্ষমতাবান, দরদী একজন মানুষ হিসেবে। রাম, কৃষ্ণ, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি বিষ্ণুর নানা অবতারের গল্প প্রচার করা হয়, নাম দেওয়া হল 'পুরাণ' এবং তাদের ঘিরে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে, এদের কাউকে কাউকে আবার বিশেষ উদ্দেশ্যেও লাগানো হয়। যেমন আর্যরা যখন দাক্ষিণাত্য (যথাসম্ভব শ্রীলংকা নয়) অধিকার করে তখন বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের কথা বলা হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে গুপ্ত যুগে—৪র্থ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময় কালে—হিন্দুধর্মের বহুবিধ রূপান্তর ও সংযোজন ঘটানো হয়, যার অনেককিছু বর্তমানেও অনুসরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই আধুনিক হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপকভাবে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা, অবতারতত্ত্ব (গুপ্ত যুগে মূলত কৃষ্ণ ও বরাহ অবতারের পূজা করা হত) ইত্যাদির পাশাপাশি আরাধ্য হিসেবে নারীদেরও সামনে আনা হল—স্পষ্টতঃই, এটিও ছিল ধর্মের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সহায়ক আরেকটি পদ্ধতি। বৈদিক যুগে লক্ষ্মীর মতো দু'একটি দেবীর কথা বলা হলেও তারা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; ৪র্থ শতাব্দী সময়কালে গুরুত্বদিয়ে দুর্গার প্রচলন করা হল—আরো পরে কালী ইত্যাদির।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনারও কণ্ঠরোধ করা হয়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ছিলেন আর্যভট্ট (জন্ম: ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। 'পাই'-এর মান নিরূপণ (৩.১৪১৬ অব্দি), পার্থিব বছরের সময়কাল নির্ণয় (৩৬৫.৩৫৮৬-৮০৫ দিন), পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান চরিত্র ও গোলাকৃতি সম্পর্কে ধারণা, পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার ঘটনা, জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্যোতিষ ও অঙ্ক থেকে আলাদা একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নানা কাজকর্ম তিনি করেন। কিন্তু এর ফলে হিন্দুদের গোঁড়া, অবৈজ্ঞানিক নানা

ধ্যান-ধারণার ভিত্তি কেঁপে ওঠে। এই গোঁড়া, ধর্মবিশ্বাসী পুরোহিত গোষ্ঠীকে (ও শাসক বৃন্দকেও) সন্তুষ্ট করতে আর্যভট্টের পরবর্তীকালের জ্যোতির্বিদেরা আর্যভট্টের অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও কাজের বিরোধিতা করেন। যেমন বরাহমিহির (জন্ম ঃ ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ) জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চাকে সমান গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শাখায় বিভক্ত করেন—জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্ক, কুষ্ঠিবিচার, এবং জ্যোতিষবিদ্যা। এইভাবে অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষবিদ্যাকে (তথা কর্মফল, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ ইত্যাদিকে) বরাহমিহির সমান—এমন কি বেশি—গুরুত্ব দিলেন, যা আর্যভট্ট অবৈজ্ঞানিক বলে বাতিল করেছিলেন।

এই সময় সতীদাহ প্রথা ও গৌরীদানকেও মহান কাজ বলে প্রচার করা হয় যা পরবর্তী কালে বাংলা সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাল বংশ স্থাপনের পর (গোপাল-এর দ্বারা ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে) ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিরল দু'একজন মহিলা অধ্যাপক ও দার্শনিক ছাড়া, সাধারণভাবে নারীদের হতমান করে রাখাই হয়। অভিজাত ধনী মহিলাদের কারো কারোর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল—কিন্তু তা ছিল কথাবার্তা তারা যাতে ভালভাবে বলতে পারে তার জন্য, জনসমক্ষে ব্যবহারের জন্য নয়। নারীদের পেশা হিসেবে বলা ছিল নটী, বেশ্যা ইত্যাদি—সম্মানিত কোন পদ নয়। কেউ কেউ অবশ্য হিন্দু ধর্মত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীও হয়ে যান।

'দ্বিজ' কথাটির দ্বারা এই সময় প্রধানত ব্রাহ্মণদের বোঝানো হতে শুরু করে এবং ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা রক্ষা চরম গুরুত্ব পায়। অস্পৃশ্য বা শূদ্রা কাছাকাছি এলেও ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ হতে হত। ধর্মের নামে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের তথাকথিত পবিত্রতা রক্ষা করা, নানা ধরনের ধর্মীয় নিয়মকানুন ও অনুশাসন ইত্যাদি কঠোরভাবে পালন করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বহির্ভারতে বাণিজ্য চলতই, কিন্তু ধর্মকাররা সমুদ্র যাত্রাকে অধর্মীয় কাজ বলে ফরমান দেন। এর ফলে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে হিন্দুদের মেলামেশা হয়ে হিন্দুত্বের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার ভয় দেখানো হয়। বাইরে গিয়ে জাতপাতের খুঁটিনাটিও মানা সম্ভব নয়। এইভাবে বাইরের জ্ঞান আহরণও দৃষ্টির প্রসারকে সীমায়িত করার চেষ্টা করা হয়। জড়বদ্ধ পরিবেশ ও মানসিকতায় আটকে রাখার একটি প্রচেষ্টা ছিল এটি। এর ফলে ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ী তথা বৈশ্যদের অর্থনৈতিক উত্থানকেও কিছুটা আটকাতে সক্ষম হয়, অন্তত তার চেষ্টা করে।

এই গুপ্ত যুগ তথাকথিত হিন্দুধর্মের নানা সংস্কার, আচার-নিয়ম ইত্যাদি বিকাশের স্বর্ণযুগ। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈনধর্ম, গ্রীক সভ্যতা ইত্যাদির প্রভাব ও চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্তরসূরীরা এই ধরনের কঠোর, যান্ত্রিক নিয়ম কানুন ধর্মের নাম করে প্রচার করতে বাধ্য হন—নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টায়।

কল্পিত অবতারতত্ত্বেরই পরবর্তী ফল নানা গুরুর তথা গোষ্ঠীর সৃষ্টি। ধর্মমতে অনৈক্য ও বিভেদ (schism) এর মূলে—কখনো বা বিশেষ স্বার্থের কারণে, কখনো বা উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও জনকল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে। গুরুরা অবতারের আরো সরলীকৃত, আরো গণতন্ত্রীকৃত রূপ। এক-একজন গুরু এক-একটি দেবতা তথা অবতারের প্রতিনিধি হয়ে উঠল। মানুষের মধ্যে বাস করে ধর্মোপদেশ দেওয়া থেকে শুরু করে নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো পর্যন্ত নানাবিধ কাজই সে করল।

হিন্দুধর্মের এই বিকশিত নানাবিধ দিকের সঙ্গে নানা সময়েই মিশেছে আরো অজস্র দিকও -এসেছে আদিম গোষ্ঠীর থেকে জীবজন্তু পূজা, সৃষ্টি হয়েছে গণেশ পূজা, সর্প পূজা। কখনো বা কৃষিভিত্তিক সমাজে অর্থনৈতিক কারণে জন্ম নিয়েছে গরুকে দেবতা ভেবে পূজা করা (প্রকৃত অর্থে সংরক্ষণ করা—যাতে মুণিঋষি ও অন্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গোমাংসভক্ষণ আর বলি দেওয়া, উৎসর্গকরা ইত্যাদির জন্য ব্যাপক গোহত্যা বন্ধ করা যায়।) বিশেষ নদীকে ঐ অর্থনৈতিক কারণে পূজ্য বলে কল্পনা করা হয়েছে, যেমন গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা। মুণ্ডারা যেমন তাদের ধরিত্রীদেবী মেরিয়া-র কাছে বালক বলি দিত, তেমনি শক্তির প্রতীক কালীর কল্পনা করে তার কছে চালু হল নরবলি।

৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দী সময়কালে বেদ-ব্রাহ্মণকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে হিন্দুধর্মের মধ্যেই একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে—যাকে ভক্তি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা যায়। কল্পিত ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্বাস তখন প্রবল ও গভীর। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে, ঈশ্বর বা নানা দেবদেবীকে সরাসরি ভালবাসা ও তার সঙ্গে সরাসরি নিজের যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা,—ব্রাহ্মণকে মাধ্যম করে নয়, বা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয়। বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এইভাবে বহু ব্যক্তিত্ব, ভক্ত বা সন্ত-এর সৃষ্টি হয়।। শিবভক্তরা হল শৈব, দাক্ষিণাত্যে এদের নাম নায়নার;

বিষ্ণুভক্তরা বৈষ্ণব, দাক্ষিণাত্যে এদের নাম আলভার। মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাসের প্রাবল্যে এ সব ভক্তের কেউ কেউ মানসিক অসুস্থতার শিকার হতেন এবং নানা অবাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, (এখনো করেন) যেমন কালী শিব কৃষ্ণের বা রাধার দেখা পাওয়া (visual hallucination), কৃষ্ণের বাঁশী বা পায়ের নূপুরের শব্দ শোনা (auditory hallucination), দেবতার হাতের ছোঁয়া পাওয়া (tactile hallucination) ইত্যাদি। এঁদের সাধারণভাবে শামান (shaman) নামে অভিহিত করা যায়। ব্রাহ্মণ আধিপত্য ও জাতপাতের ভেদাভেদকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে, ভক্তি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘিরে আপামর জনসাধারণই জড়ো হন, নিজেদের ঈশ্বর-বিশ্বাসেব জায়গা থেকে।

মূলত দক্ষিণভারতে (তামিল অঞ্চলে) এই আন্দোলন শুরু হয়। চতুর্দশ শতাব্দী সময়কালের মধ্যে উত্তর ভারতে এবং অন্যান্য এলাকায়ও এটি ছড়িয়ে পড়ে। বেদ-বর্ণাশ্রম ইত্যাদি তথা হিন্দুধর্ম যে চিরন্তন, ঐশ্বরিক কিছু নয় তা ভক্তি আন্দোলনের নেতারা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন—যখন নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে, কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানা-দিকে চূড়ান্তভাবে পরিমার্জিত করেছেন। বাজপুত রাণী মীরাবাই, আগ্রার অন্ধকবি সুরদাস, কাশ্মীরের লালা, পশ্চিমভারতের কবির ও নানক, পূর্ব-ভাবতের শ্রীচৈতন্য (নিমাই) ইত্যাদি বহু ব্যক্তিই বিভিন্ন সময়ে নিজের মত করে এই আন্দোলনের কথা বলেছেন বা নেতৃত্ব দিয়েছেন; সম্প্রতি গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণও এই ভক্তি মানসিকতার (অর্থাৎ দেবদেবী ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদের) ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি,—বিশেষ সামাজিক পরিবেশে ও প্রয়োজনে।

নানা ক্ষেত্রে, ভারতে আগত ইসলামধর্মালম্বীদের শিয়াগোষ্ঠী থেকে সৃষ্টি হওয়া সুফিদের সঙ্গে এই ভক্তিআন্দোলনের নেতাদের মানসিকতার মিল রয়েছে। এই মিল থাকার কারণে সুফি ও তাঁদের বিভিন্ন প্রচারক (পীর, ফকির ইত্যাদি) বা বিভাগ (চিস্তি, ফিরদৌসি ও সুহ্‌রাবর্দী) হিন্দুধর্মালম্বীদের একাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ভক্তি আন্দোলনের অধিকাংশ নেতারাই নিজেদের অবতার ইত্যাদি নামে অভিহিত না করলেও পরবর্তিকালে তাঁদের অন্ধ ভক্তরা নিজেদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের উপর অবতারত্ব আরোপ করেছে। (অবশ্য এঁদের

মধ্যে দু'একজন ব্যতিক্রম ছিলেন, যাঁরা নিজেরাই নিজেদের অবতার হিসেবে প্রচার করতেন—কেউ বলেছেন তিনি বিষ্ণুর অবতার, কেউ বলেছেন অমুক ঠাকুর আর তমুক ঠাকুর মিলিয়ে তিনি; কেউ বা আবার অন্যদিকে চৌদ্দ পুরুষের ঠিকুজি ঘেঁটে কারোর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক খুঁজে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রচার করে।)

এধরনের নানা ধর্মীয় আন্দোলনই (যা আসলে সামাজিক বিক্ষোভ ও আন্দোলন) পুরনো নানা প্রথা বা ধারণার পরিমার্জনা করেছে। যেমন, ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্রাদিতে নারীদের সামাজিক কাজকর্মে অংশ-গ্রহণ ছিল অতি সীমিত। ভক্তি আন্দোলন, পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্যসমাজ আন্দোলন ইত্যাদিগুলি নারীদের কাজের ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে কিছুটা সম্মান দেয় এবং চতুবর্ণাশ্রম, অন্ধ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিকেও কমবেশি সংশোধন করে।

ষষ্ঠ শতাব্দী সময়কালে হিন্দুধর্মের মধ্যেই আরেকটি ধারা বিকশিত হয়—যা তন্ত্র নামে অভিহিত। তান্ত্রিক মতে পুরুষ নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েই তার শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে, তাই দেবতাদেরও স্ত্রী (সঙ্গিনী) প্রয়োজন হয়; আর এ থেকে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এবং শিবের স্ত্রী দুর্গা তথা কালী তথা পার্বতী বা তারা ইত্যাদি দেবীর পূজো এই তন্ত্রে প্রাধান্য পায়। উত্তরপূর্ব ভারতে ৮ম শতাব্দীর সময় এই তন্ত্রমত বিকশিত হয়। (পরবর্তী-কালে তিব্বতেও যায় এবং বৌদ্ধধর্মেও অনুপ্রবেশ করে।) তন্ত্রপদ্ধতি বৈদিক ধারার সরলীকৃত রূপ হিসেবে অভিহিত এবং নারীদের অংশগ্রহণ এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নানা ধরনের কল্পিত রহস্যময় পদ্ধতি, প্রতীক, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি—নিরর্থক হলেও—তন্ত্রাক্ত মতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নারীশক্তি তথা মাতৃ আরাধনার প্রাধান্য থেকে এটি অনুমান করা যায় তন্ত্র মূলত অনার্য প্রভাবে বিকশিত এবং প্রকৃতপক্ষে আর্যদের প্রভাব যে সব এলাকায় কম ছিল ঐ সব জায়গাতেই এটি প্রধানত বিকশিত হয়, পরবর্তিকালে ধীরে ধীরে এটি হিন্দুধর্মের একটি ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়।

এসব থেকে শুরু করে আধুনিককালে সৃষ্টি হয়েছে আরো নানা গুরু বা অবতারের—রামকৃষ্ণ, সাঁইবাবা, অনুকূল ঠাকুর, মোহনানন্দ, ওঙ্কারনাথ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিক ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সৃষ্টি হয়েছিল আর্য সমাজ—যারা আবার বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

সম্প্রতি আবার তথাকথিত হিন্দুদের নানা সংগঠনও গড়ে উঠেছে—অধিকাংশ হিন্দু তার অন্তর্ভুক্ত না হলেও। এ-সব সংগঠনের কেউ বা বেশি, কেউ বা কম হিন্দুধর্মের কথা বলে, কেউ বলে নিছক রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার জন্য, কেউ বা নিছক অন্ধ বিশ্বাসের কারণে। কিন্তু এঁরাও বেদ বা উপনিষদ বা 'মনুসংহিতা' বা পুরাণের নানা তত্ত্বের কোন্‌টি বাদ দিচ্ছেন কোনটি রাখছেন তা স্পষ্ট করে বলেন না। তবে এটি স্পষ্ট যে সবকটাকে মানা সম্ভব নয়। কারণ বেদ মানতে গেলে চতুর্বর্ণ মানা চলবে না, কিংবা কুষ্ঠ-যক্ষ্মা হলে বা সাপে কামড়ালে হাসপাতালে যাওয়া চলবে না। 'মনুসংহিতা' মানতে হলে, কোনো অব্রাহ্মণ (শূদ্র) ব্রাহ্মণের চুল ধরলে তার হাত কেটে ফেল্‌তে হবে, কিংবা সব ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বেদ পাঠ করতে হবে, ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কাউকে মন্ত্রী বা পঞ্চায়েত প্রধান করা চলবে না, শূদ্র ছাড়া আর কারোর চাকরি করা চলবে না (কারণ 'মনুসংহিতা'য় একমাত্র শূদ্রবর্ণের জন্যই অন্য তিনবর্ণের সেবা করার কাজ সংরক্ষণ করা হয়েছে) ইত্যাদি।

হিন্দুধর্ম উৎস বিচারে গত প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। তার নানা কিছু আজ গোঁড়া হিন্দুও অনুসরণ করেন না, আবার বিশেষ কিছু ঘটনা বিশেষ উদ্দেশ্যে কেউ কেউ ব্যবহার করে—এমনকি রাজনৈতিক নেতা হওয়ার জন্যও। অন্য ধর্মের মত হিন্দু ধর্মকেও শাসক শ্রেণী ব্যবহার করেছে এবং সম্প্রতি একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য কিছু ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছে, মানুষকে প্রতারিত করছে। এগুলি এটিও প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে, অন্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মও মানুষেরই সৃষ্টি, তার নিজেরই প্রয়োজনে। নানা মানুষ নানাভাবে এর যে পরিমার্জনা করেছেন, নানা গোষ্ঠী ও দলের সৃষ্টি করেছেন তার তালিকাও বিশাল।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে লিখেছেন, "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।...আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা

দিয়াছি ; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি ; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।"

ধর্মের নামে মানুষকে এমন অশুচি, অস্পৃশ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার এ ধরনের উদাহরণ আরো অসংখ্য আছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই বিশ্বমানবিক সত্যকে উপেক্ষা করাটা তখনি সহজ হয়ে ওঠে, যখন মানুষের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তার ধর্মবিশ্বাস, অন্য কোন গুণাবলী নয়। ভারতবর্ষে বহু হিন্দুধর্মাবলম্বীরা এরকম নির্লজ্জ ব্যবহারে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত। বিগত ৭ম-৮ম শতাব্দীতে এদেশে যখন মুসলিম অনুপ্রবেশ শুরু হয়, তারপর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্কে এ ধরনের ধর্মানুমোদিত মানসিকতা প্রচার করা শুরু হয়। প্রথমত, হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারী সমাজ-পতিরা নিজেদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বলে অভিহিত করতে হয়তো বাধ্যই হয়। 'মনুসংহিতা' তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যান্য সাংবিধানিক বিবৃতিতে, বিশেষত শূদ্র সম্পর্কে এ ধরনের মানসিকতার পরিমণ্ডল ছিলই। ফলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের সম্পর্কেও এমন ধারা প্রচার নতুন করে অমানবিক ও বেহায়াপনা হিসেবে সাধারণভাবে মনে হয় নি। হিন্দু সমাজ এ ধরনের মানসিকতায় অভ্যস্ত ছিলই-শুধু তার বিস্তৃতি ঘটল। দ্বিতীয়ত, ইসলাম ধর্মে অন্তত এটি ছিল না যে, একই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদেরই একটা বৃহৎ অংশকে 'নীচ' বা অস্পৃশ্য বলে বিভাজন করতে হবে। ফলে হিন্দু শাসককুলের দাক্ষিণ্যে লালিত বিপুল সংখ্যক অন্ত্যজ ও শূদ্র স্থানীয় মানুষ ইসলামধর্মের কিছু মানবিক দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, ধর্মান্তরিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুসলিমরা কিছু ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতায় আসার ফলে, তাদের জোরজবরদস্তি ও অত্যাচারে এবং তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য কিছু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এসব কিছুই হিন্দু শাসককুলকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। ধর্মান্তরের এই হিড়িক আটকানোর জন্যও প্রয়োজন হয়। হিন্দুধর্মকে অন্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার। ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, হিন্দু শাসককুল এ মানসিকতার প্রতিষ্ঠা সহজতর ভাবে করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু মানুষের কল্পনায় লালিত ধর্মবিশ্বাস যখন গোঁড়ামি, অন্ধতা ও যুক্তিহীনতায় পর্যবসিত হয়, তখন শুধু হিন্দুধর্মই নয়, সব ধর্মের মধ্যেই এই নির্লজ্জ অমানবিকতা প্রকাশ পেতে বাধ্য। সব ধর্মেই এই ধরনের মানসিকতা কখনো কম, কখনো বেশি, নানা আকারে পরিস্ফুট হয়েছে – ব্যাপারটি শুধু হিন্দু শাসককুলের একচেটিয়া নয়। কোনো কোনো ধর্মে, নিজস্ব উদারতা সত্ত্বেও, এই গোঁড়ামি ভিন্নধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণে বর্বরতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার একটি হলো ইসলাম ধর্ম। আর এর হোতা অবশ্যই অগণিত মুসলিম জনগণ নয় – তাদের মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী শাসক-গোষ্ঠীই। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, "পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র – সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।...অপর পক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদের মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে অকর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation। ...ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল।·" (শ্রীকালিদাস নাগকে লেখা চিঠি কালান্তর)।

আর এভাবেই অত্যুগ্র ধর্মান্ধতার জন্য ইসলাম ধর্মও প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের আরেক পিঠের মতোই (অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও এটি কমবেশি সত্য)। ভারতের তথা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম; তার এই অত্যুগ্রতার বহিঃপ্রকাশ হয়ে চলেছে অবিরামভাবে এবং সেখানেও একইভাবে ভুলে যাওয়া হয় যে, মানুষের কল্পনার সন্তান ও মানুষের প্রয়োজনে লালিত সেই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, মানুষেরই বিশেষ প্রয়োজনে যে ধর্মমত গড়ে তোলা হয়েছে, সেটির পরিবর্তন ও বিলুপ্তি একদিন মানুষের প্রয়োজনে হতেই পারে—যা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য।

এই প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে মেটানো হয়েছে। আর এরই কারণে হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম (ভারতের দুই বৃহৎ

ভারতীয় সমাজের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জী

এখানে ভারতীয় ইতিহাসের ধর্মীয় ও সামাজিক কয়েকটি ঘটনার সময়কাল উল্লেখ করা হল।

* খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—হরপ্পা সংস্কৃতি
* খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—হিন্দুকুশ দিয়ে আর্যভাষীদের ভারতে আগমন
* খ্রীঃ পূঃ ১৩০০—মৌখিকভাবে বেদ রচনা শুরু
* খ্রীঃ পূঃ ১০০০—৭০০—মহাভারত ও রামায়ণের মূল ঘটনার সময়কাল
* খ্রীঃ পূঃ ৮০০—লোহার ব্যবহার শুরু

খ্রীঃ পূঃ ৭০০—৩০০—ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনা

* খ্রীঃ পূঃ ৫০০—বর্ণভেদ ও চতুরাশ্রমের সৃষ্টি ; কর্মফল, জন্মান্তরের ধারণা

খ্রীঃ পূঃ ৬০০—মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান

খ্রীঃ পূঃ ৪৯৩—মগধের রাজা অজাতশত্রু

খ্রীঃ পূঃ ৪১৩—শিশুনাগ রাজবংশ

খ্রীঃ পূঃ ৩৬২—২১—নন্দ রাজবংশ

খ্রীঃ পূঃ ৩২৭—৫—ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন

খ্রীঃ পূঃ ৩২১—মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (চন্দ্রগুপ্ত), চাণক্য ও অর্থশাস্ত্র

খ্রীঃ পূঃ ২৬৮—৩১—অশোকের রাজত্বকাল

খ্রীঃ পূঃ ১২৮—১০—শতকর্ণীর নেতৃত্বে শতবাহন সাম্রাজ্য

* খ্রীঃ পূঃ ৮০—প্রথম শকরাজা
* খ্রীঃ পূঃ ৫০—কলিঙ্গের রাজা খারবেল

৩১৯—২০ খ্রীষ্টাব্দ—চন্দ্রগুপ্ত (১)-এর দ্বারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন

* খ্রীঃ পূঃ ৫০০—৫০০ খ্রীঃ—পুরাণ রচনা

৬০৬-৪৭ খ্রীঃ—কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন

৬০০-৩০ খ্রীঃ—পল্লব রাজবংশের শুরু (মহেন্দ্র বর্মন-১)

৭১২ খ্রীঃ—আরবদের দ্বারা সিন্ধু বিজয়

* ৮০০ খ্রীঃ—দার্শনিক শঙ্করাচার্য

৯৯৭—১০৩০—উত্তর পশ্চিম ভারতে মহম্মদ গজনি

* ১০৫০ খ্রীঃ—দার্শনিক রামানুজ

১৪৪০—১৫১৮—কবীর

১৪৬৯-১৫৩০—নানক

১৪৮৫-১৫৩৩—চৈতন্য

(তিনজনই ভক্তি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)

(* সমসাময়িক কাল বা আনুমানিক সময়)

ধর্ম)—এদের মধ্যে গুণগত কিছু পার্থক্যও রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এর জন্য কোন ধর্ম ভাল বা খারাপ এ ধরনের বিচার বালখিল্যসুলভ প্রয়াস মাত্র। হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি ইসলামধর্ম মানুষ কীভাবে সৃষ্টি করেছে, তার শাসককুল কীভাবে অগণিত সাধারণ মুসলিমদের শাসন করার জন্য এই ধর্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় যদি বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত মানুষ হৃদয়ঙ্গম করেন, তবে বাহ্যিক অন্ধতা ও অত্যুগ্র আচরণকে যুক্তিহীন বলে বোঝা যেতে পারে।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম কথার অর্থ অনুগত হওয়া বা আত্মসমর্পণ করা। এই আনুগত্য, নিজেকে এই সমর্পণ সেই কল্পিত ঈশ্বরের কাছে যাকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'আল্লা'। অবশ্য ঈশ্বরের সমার্থক এই 'আল্লা' শব্দটির ব্যবহার শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই নন, আরবের খ্রীস্টানরাও করে থাকেন। আরবী শব্দ 'ইসলাম' থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'মুসলিম' কথাটি যার দ্বারা তাদেরই বোঝায় যারা আল্লার ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছেন। এই ধর্মমতের প্রবর্তক হজরত* মহম্মদ (পুরো নাম—আবু আল-কাসিম মহম্মদ ইবন্ আবদ্ আল্লা ইবন্ আল-মুত্তালিব ইবন্ হাশিম)। ইসলাম ধর্মে আদম, নোয়া, যীশুখ্রীস্ট ইত্যাদি ঈশ্বরের বিভিন্ন দূত বা নবী (পয়গম্বর, prophet)-এর কথা বলা হয়। মহম্মদ ঈশ্বরের শেষ দূত। এই ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ আরব অঞ্চলে। ইহুদি ও খ্রীস্টধর্ম এবং অন্যান্য নানা আঞ্চলিক ধর্ম তখন ঐ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শিশুহত্যা, ব্যভিচার, অবাধ যৌনবিহার, লুঠপাট, নরহত্যা, দাঙ্গা ইত্যাদির যেন কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, খুনজখম শুরু হয়ে যেত।

আরবের মক্কা শহরে কাবা নামে একটি ধর্মীয় স্থান ছিল। এতে ছিল অজস্র (৩৬০ টি) দেবদেবীর মূর্তি। স্থানীয় মানুষের কাছে এই অঞ্চলটি ছিল মানসিক শান্তি ও সামাজিক সুরক্ষার স্থান। এই কাবা-কে ঘিরে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল—যা মূলত নিয়ন্ত্রণ করত কোরাইশ

* 'হজরত' একটি সাধারণ সম্মানসূচক উপাধি।

বংশের লোকেরা। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে এই ব্যবসা খুবই অর্থদায়ী হয়ে ওঠে, একই সঙ্গে কিছু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হয়। উট সহ এই মরুযাত্রী ব্যবসায়ীরা ভারত-ইথিওপিয়া থেকে জিনিসপত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ে যেত, ইয়েমেন-সিরিয়ার মধ্যে (গাজা ও দামাস্কাস) ব্যবসা চলত। কিন্তু সম্পদ কুক্ষিগত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে, বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল হতদরিদ্র। এদের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দেওয়ার মতো মূল্যবোধ ও মানসিকতা ধনীদের ছিলনা; গোষ্ঠীগত ঐক্যও ভেঙে যাচ্ছিল।

এই চরম অনাচার ও অমানবিক অবস্থার মধ্যে জন্মেছিলেন মহম্মদ। তিনি তাঁর সুদক্ষ সামরিক ক্ষমতার সঙ্গে ঈশ্বরিক নির্দেশাবলী হিসেবে নানা নিয়মকানুনের প্রচারকে নিপুণভাবে মেশান এবং জীবদ্দশাতেই প্রায় সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করেন। জন্ম দেন ইসলামধর্মের—যার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন আরব জাতি। খ্রীস্ট বা হিন্দুধর্মের মত, মহম্মদের জীবনকে ঘিরে বিশেষ কোনো অলৌকিক ঘটনা বা ক্ষমতার কথা প্রচারিত হয় নি। তথাকথিত জটিল ও দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিকতার কথাও বলা হয় নি। 'সব মানুষ সমান'—এ জাতীয় সহজ সরল কথাবার্তা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-সামরিক প্রয়োজনে, নিজেদের স্বার্থে সৃষ্টি করা নানা নিয়মাবলী—এগুলিই ইসলামধর্মের মূল কথা।

৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ আগস্ট, সোমবার, মহম্মদ মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই বাবা আবদুল্লা মারা যান, মা আমিনা মারা যান মহম্মদের ছ' বছর বয়সে। তাঁরা ছিলেন কোরাইশদের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী হাশিম-এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন এই হাশিম গোষ্ঠীর নেতা। ইনি মারা যাওয়ার পর মহম্মদ কাকা আবু তালিবের কাছে থাকেন। মহম্মদ ছিলেন নিরক্ষর। ছোটবেলায় মেষ চরাতেন। বড় হয়ে কাকার সঙ্গে ব্যবসায় সিরিয়াতে যাতায়াত করেন। ৫৯৫ সাল নাগাদ এমনই এক ব্যবসায়িক যাত্রায় খাদিজা নামে এক ধনী ব্যবসায়ী মহিলার সঙ্গে মহম্মদ পরিচিত হন। ৪০ বছর বয়সী এই মহিলা মহম্মদের দ্বারা এমনই প্রভাবিত হন যে, শেষ অব্দি তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের দুই ছেলে হয়—তারা অকালে মারা যায়; আর হয়েছিল ৪টি মেয়ে। ব্যবসায়িক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে, ৬১০ সালের কাছাকাছি সময়ে মহম্মদ মক্কার তিন মাইল দূরে হেরা পর্বতগুহায় মাঝে মাঝে নির্জনে সময় কাটাতে থাকেন; এসময়ই

একদিন দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের তিনি দর্শন পেয়েছেন বলে তার মনে হয় এবং শোনেন দেবদূত তাকে বলছেন, 'তুমি ঈশ্বরের দূত'। এরপর থেকে মৃত্যু অবধি মাঝে মাঝেই এমন দৈববাণী বা ঈশ্বরের নির্দেশ (ওহী) তিনি শুনেছেন বলে বলা হয়। গ্যাব্রিয়েল দর্শনের পর মহম্মদ অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন। স্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দেন ও শান্ত করেন। এরপর এ ধরনের 'দর্শন' তিনি আর পান নি, যদিও বাণী শুনেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে, এই ধরনের অস্বাভাবিক অনুভূতির সময়, "মাঝেমাঝেই তাঁর শরীর ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এধরনের ঘটনা থেকে এটি অনুমান করা হয়েছিল যে তাঁর মৃগীরোগ ছিল — অবশ্য বর্তমানে এটি চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠিত মত নয় ; মাঝে মাঝে কোন বাণী ছাড়াই তিনি ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পেতেন।"

এধরনের বাণী মহম্মদ একবার 'শুনেই' মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী খাদিজা-র খ্রীস্টান ভাই ওয়ারাকা-র সাহায্যে এইসব বাণীর ব্যাখ্যা করেন। দেখা যায় ইহুদি ও খ্রীস্টধর্মের এবং অন্যান্য স্থানীয় বিশ্বাসের অনেক কিছুর সঙ্গে এগুলির মিল রয়েছে।

৬১৩ সাল থেকে মহম্মদ এই সব বাণী প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকেন। একেশ্বরবাদের নামে, দুর্বলদের সাহায্য করা আর অত্যাচারীর মোকাবিলার কথা বলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর ৩৯ জন অনুগামী জুটেছিল। এঁরা আরকাম নামে এক বন্ধুর বাড়িতে একসঙ্গে এগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন, মাঝে মাঝে কাবা-য় একসঙ্গে পুজো করতেও যেতেন। এই অনুগামীদের প্রায় সবাই-ই ছিলেন মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের ছেলে বা ভাই। কিন্তু মহম্মদের শোনা ও প্রচার করা ঐ দৈববাণীগুলি ছিল আসলে সামাজিক নানা সংস্কারমূলক আচরণবিধি। মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের ব্যবহার ও প্রচলিত মানসিকতার সমালোচনায় প্রায়শই এগুলি মুখর ছিল। এই অর্থকেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মানসিকতার বিরুদ্ধে মহম্মদের কথাবার্তা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে দেখে ধনী গোষ্ঠী মহম্মদের সামনে নানাবিধ প্রলোভন হাজির করতে থাকেন, যেমন ব্যবসায় অংশীদার করা, সবচেয়ে ধনী পরিবারের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ইত্যাদি। এধরনের বহু বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে কোরাইশ গোষ্ঠীর লোকেরা কাবা-র পুজো থেকে বিপুল আয় করত। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার প্রধান কারণ ঃ মহম্মদ বলতে থাকেন, একমাত্র নিরাকার আল্লা-তেই বিশ্বাস করতে হবে, অন্য

দেবদেবী সব মিথ্যা। তিনি বলেন যারা এই আল্লায় আত্মসমর্পিত তারা সব সমান, ভাই-ভাই ; তারা মুসলিম, আর তিনি নিজে এই আল্লা-র প্রেরিত দূত (রসুল)। তিনি ও তার বন্ধুরা কাবা-কে আক্রমণ না করলেও, অন্যান্য মূর্তিগুলির উপর আক্রমণ চালান।

মক্কার বিরক্ত সন্ত্রস্ত ধনী ব্যবসায়ীরা মহম্মদের উপর নানাভাবে ব্যবসায়িক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ৬১৬ সালে আবু জাহল নামে একজন হাশিম গোষ্ঠীকে (কোরাইশদের এই অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মহম্মদ) একঘরে অর্থাৎ বয়কট করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই এই বয়কট আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে যায়—যারা এটি করছিল তারা সম্ভবত এক সময় বুঝতে পারছিল যে, এর দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬১৯ সালে কাকা আবু তালিব (ইনি খাদিজারও সম্পর্কে কাকা ছিলেন) মারা যান ; হাশিম গোষ্ঠীর নতুন প্রধান হন আবু লাহার। ইনি মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের কাছের লোক ছিলেন। এঁর যোগসাজসে হাশিম গোষ্ঠী মহম্মদকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীরা যে কোনো সময় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাঁরা পাশের শহর আত্-তাইফ-এ চলে যান। কিন্তু এখানে তাঁর মত গ্রহণ করার লোক পাওয়া গেল না। এই সময় মক্কার আরেক প্রতিযোগী গোষ্ঠীর কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। ৬১৯ সালে স্ত্রী খাদিজাও মারা যান।

৬২০ সাল নাগাদ মহম্মদ দূরের শহর মদিনা-র লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে থাকেন। ৬২১ সালে মদিনা থেকে ১২ জন ব্যক্তি কাবা-য় তীর্থ করতে এসে মহম্মদের সংস্পর্শে আসেন এবং মহম্মদের অনুগামী অর্থাৎ মুসলিম হন। ৬২২-এর জুন মাসেও দু'জন মহিলা সহ ৭৫ জন এভাবে এসে মুসলিম হয়ে যান। এঁরা মহম্মদকে নিজের আত্মীয়ের মতো রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন (আল-আকাবা-র দুই অঙ্গীকার)। মদিনায় ছিল মরূদ্যান, ছিল কৃষিজীবী মানুষ, ছিল ইহুদি ও অন্যান্য নানা উপজাতি, গোষ্ঠী। এদের মধ্যে মারামারি লেগেই ছিল। ৬১৮ সালে এখানে রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ যুদ্ধও হয়। এই অস্থির ও অর্থনৈতিক ভাবে চরম বৈষম্যমূলক সামাজিক পরিমণ্ডলে মহম্মদ বন্ধু আবু বকরকে নিয়ে ৬২২ সালের ২৪

সেপ্টেম্বর চলে আসেন। (এই বছরেরই প্রথম আরবী বাৎসরিক দিন অর্থাৎ ১৬ জুলাই থেকে ইসলামী বছর তথা হিজরা সন. **Anno Hegirae, AH** গণনা শুরু হয়।) প্রথম পাঁচ বছর তাঁর কর্তৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ইহুদিরাও তাকে নবী হিসেবে অস্বীকার করেন। তবে মদিনায় তার অনুগামীরা তাকে জমিজায়গা দিয়েছিল, মহম্মদ এ জায়গায় একটি বাড়িও করেন (এই বাড়িটি পরে মদিনার বিখ্যাত মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে)। মদিনায় তাঁর প্রথম ১৮ মাস এভাবে একটু গুছিয়ে নিতেই কেটে গেছে এরপর ধীরে ধীরে মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে নিজের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। পরে কিছু ধনী ও প্রভাবশালী লোক এবং ভালো সংখ্যার দরিদ্র ও ক্রীতদাস (গোলাম) তার ধর্মমত গ্রহণ করেন।

ঐ সময় মক্কার ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে দল বেঁধে সিরিয়া সহ অন্যত্র ব্যবসা করতে যেতেন। সারিসারি উটের পিঠে পণ্য চাপিয়ে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁরা পথ চলতেন—সঙ্গে থাকত অস্ত্রশস্ত্র, কারণ দস্যুদের আক্রমণ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাদের মোকাবিলা করেই ব্যবসা চালাতে হতো। মদিনার সঙ্গে মক্কার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সামাজিক শত্রুতাও ছিল। ৬২৩ সালের মধ্যে মহম্মদ নিজে এভাবে তিনবার হানা চালান, কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬২৪-এর জানুয়ারিতে ইয়েমেন থেকে প্রত্যাগত একটি ব্যবসায়ী দলের উপর মহম্মদ স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে আক্রমণ চালান এবং সফল হন। মক্কাবাসীরা মহম্মদের শক্তির আভাস পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

এ সময় মহম্মদ তাঁর কয়েকটি নীতির পরিবর্তনও করেন। যেমন, এর আগে ইহুদিদের মধ্যে নিজেকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে গ্রহণীয় করার জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু এবার ইহুদিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি।

এদিকে ৬২৪ সালের মার্চেও মহম্মদ সিরিয়া থেকে প্রত্যাগমনকারী আরেক ব্যবসায়ীদলের উপর মাত্র ৩১৫ জন অনুগামী নিয়ে হানা দিয়ে সফল হন। মহম্মদ এই সাফল্যকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহে সম্ভব হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেন। এটিই বদরের বিজয় নামে বিখ্যাত। ক্রমশই মহম্মদের সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সবক্ষেত্রেই তিনি এসবকে আল্লার অনুগ্রহ তথা ইসলাম ধর্মানুসরণের যথার্থ ফল বলে বর্ণনা করেন। এধরনের আক্রমণের নাম দেওয়া হয় রাজ্জিয়া বা থাজাওয়াত।

কিন্তু মদিনাতেও কিছু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। স্থানীয় ইহুদিদের সঙ্গে মিলে আবদ্ আল্লা ইবন উবেয়ী এ ধরনের একটি বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। এ ধরনের নানা বিরুদ্ধাচরণের মোকাবিলার জন্য মহম্মদ নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এর একটি ছিল বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন। নিজে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বা রসুল হলেও, মুসলিম গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে অন্যজন মনোনীত হতেন—তাঁর উপাধি ছিল খলিফা। মহম্মদ প্রথম খলিফা (হজরত) আবু বকর-এর মেয়ে আইশাকে আগেই বিয়ে করেছিলেন (প্রথমা স্ত্রী খাদিজা-র মৃত্যুর পর)। এখন দ্বিতীয় খলিফা উমরের মেয়ে হাফসাহ-কেও বিয়ে করলেন। নিজের মেয়ে উম কুলথুম (বা উম্মে কুলসুম)-এর সঙ্গে বিয়ে দিলেন উসমান-এর (ইনি পরে তৃতীয় খলিফা হন) এবং আরেক মেয়ে ফাতিমা-র সঙ্গে (হজরত) আলী ইবান আবু তালিব-এর (চতুর্থ খলিফা)। পাশাপাশি আশেপাশের শত্রু স্থানীয় যাযাবর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও রাহ্জিয়া পরিচালনা করে সফল হন ও তাদের বশীভূত করেন। এভাবে মহম্মদের প্রভাব ক্রমে বাড়তেই থাকে।

কিন্তু মক্কাবাসীরা বসে নেই। ৬২৫-এর ২১ মার্চ আবু সুফিয়ান-এর নেতৃত্বে ৩000 মানুষের এক বাহিনী মহম্মদের আশ্রয়স্থল মদিনার মরূদ্যান আক্রমণ করে। মহম্মদ ১000 অনুগামী নিয়ে শত্রুদের ডিঙিয়ে উহুদ পাহাড়ে চলে আসেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মহম্মদ সম্পূর্ণ সাফল্য যাকে বলে তা অর্জন করতে পারেন নি—ফলে এই যুদ্ধকে আগের সাফল্যের মতো ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা অনুগ্রহ না বলে, ভিন্নতর ব্যাখ্যার সাহায্যে অনুগামীদের মধ্যে বিশ্বাস অটুট রাখেন। আবু সুফিয়ান আবার আক্রমণ চালায়। মহম্মদ চারপাশে পরিখা খুঁড়ে দক্ষ সামরিক নেতৃত্ব দেন এবং এবারে সফল হন। এই সাফল্যের পর মহম্মদ অনায়াসে মক্কা আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এ ধরনের আক্রমণে না গিয়ে; তিনি মক্কাবাসীর স্বেচ্ছা আনুগত্যের জন্য অপেক্ষা করেন। পাশাপাশি তিনি এও বোঝেন, আরব গোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যেই যদি রাহ্জিয়া চালাতে থাকে তবে তা নিজেদের শক্তিকেই ক্ষয় করবে।

ইতিমধ্যে মহম্মদ কুবেইজা-র ইহুদিদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তথা কাফের হিসেবে অভিহিত করে, নতিস্বীকার করা সমস্ত

পুরুষ ইহুদিদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেন।

পরে ৬২৮ সালে উৎসর্গ করার জন্য জীবজন্তুদের নিয়ে মহম্মদ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু অনুগামীর সংখ্যা আশানুরূপ হয় নি—ছিল মাত্র ১৬০০ জন। মক্কাবাসীরা তাঁকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে মহম্মদ মক্কায় না ঢুকে আল-হুদাইবিয়া শহরে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং অবশেষে মক্কাবাসীদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, ৬২৯ সাল থেকে মক্কার কাবায় তীর্থ করতে যাওয়া যাবে। এর কয়েক মাস পরে মহম্মদ খাইবার মরূদ্যানের ইহুদিদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং তাদের খেজুর উৎপাদনের অর্ধেক কর হিসেবে দিতে বাধ্য করেন।

মোটামুটি এই সময়ে মহম্মদ আবার দুজনকে বিয়ে করেন—উস হাবিবা নামে ইথিওপিয়ায় মারা যাওয়া এক মুসলিমের বিধবাকে এবং মক্কায় তাঁর কাকা আল-আব্বাস-এর শ্যালিকা ময়মুনাহ্-কে।

এদিকে ৬২৯ সালের নভেম্বর মাসে চুক্তি লঙ্ঘন করে মক্কা থেকে আবার আক্রমণ চালানো হলে মহম্মদ ১০,০০০ লোক নিয়ে মক্কা অভিযান করেন ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে। মক্কাবাসীরা নতি স্বীকার করে এবং বহুজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মহম্মদ ১৫-২০ দিন মক্কায় থাকলেন। কাবা-র সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করলেন এবং মক্কার শাসন সংক্রান্ত শৃঙ্খলাদি ফিরিয়ে আনলেন। ধনী মক্কাবাসীদের বাধ্য করলেন দরিদ্র মুসলিমদেব জন্য অর্থদান করাতে। এছাড়া বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীকেও পরাভূত করলেন।

এইভাবে সমগ্র আরব অঞ্চলে মহম্মদ সামরিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সমসাময়িক আরো কিছু ঘটনাও তাঁর এই প্রতিষ্ঠাকে সাহায্য করে। যেমন ৬২৭-৬২৮ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য (খ্রীষ্টান) পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে। ফলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ইয়েমেন ও অন্যান্য স্থানের যারা পারস্য সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা মহম্মদের সাহায্য নেয় ও আনুগত্য গ্রহণ করে। আবার ৬৩০ সালেই মহম্মদ তাঁর সর্ববৃহৎ রাজিয়া চালান সিরিয়া সীমান্তে। ৩০ হাজার লোক নিয়ে তিনি সিরিয়া অধিকার করেন। সিরিয়ার অনেক খ্রীস্টান ছিল। ফলে খ্রীস্টানদের সঙ্গে মহম্মদের প্রারম্ভিক সখ্যভাব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়।

৬৩১ সালে আরবের অন্যান্য অঞ্চলের আরো বহু গোষ্ঠীর নেতাই দূত মারফৎ মহম্মদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইরাকেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

এইভাবে নিজের সামরিক দক্ষতা এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক-ব্যবসায়িক-সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নতুনতর উদার ধর্মমতের সাহায্যে মহম্মদ বিশাল আরব অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এদিকে তাঁর শরীরও ভেঙে আসছে। ৬৩১ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ মক্কায় তার জীবনের শেষ হজ (কাবা দর্শন) পালন করেন। এরপর ৬৩২ সালের ৮ জুন মদিনায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে ৬৩৩ সালে আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় (ইয়ামাসাহ্-এর যুদ্ধ)। মহম্মদের প্রত্যক্ষ সহচরদের সংখ্যা কমে যায়। এদের অনেকেই মহম্মদের প্রচারিত বাণীগুলি মুখস্থ করে রেখেছিলেন। তখন মহম্মদের আরেক সঙ্গী জায়েদ ইব্‌ন্-থাবিত কিছু কাগজে এই সব বাণী লিখে খলিফা উমরকে এবং উমরের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে হাফসাহ্-কে দেন। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাবে এই সব বাণী প্রচলিত ছিল। এ সব দেখে খলিফা উসমান (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) জায়েদ ইব্‌ন্-থাবিত সহ কয়েকজনকে দায়িত্ব দেন এইসব বাণী সংকলিত করে একটি চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য। হাফসাহ্-এর কাছ থেকে কাগজগুলি নিয়ে, বহু সাক্ষ্য গ্রহণ করে তাঁরা একসময় মহম্মদের বাণী তথা ঐশ্বরিক নির্দেশাবলীকে সংকলিত করেন। এই সংকলনই মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরিফ (এছাড়া আছে হাডিথ— যা মহম্মদের নিজস্ব কথাবার্তার সংকলিত রূপ)।

সামরিক শক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তা মিশিয়ে মহম্মদ যে-কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর অতি দ্রুত তার বিস্তার ঘটতে থাকে। সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং একই সঙ্গে অন্যধর্মাবলম্বীদের নির্মূল করার কোরআন-অনুমোদিত স্বীকৃতি থাকার ফলে ইসলামী শাসকশ্রেণী তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সাধারণ মুসলিমদের আনুগত্য সহজে পেতে থাকে। দুর্বার গতিতে ইসলাম ছড়িয়ে যায়। মহম্মদের মৃত্যুর ২০ বছরের মধ্যে বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য, লিবিয়া ও পারস্যের বিশাল এলাকা মুসলিম-অনুগত হয়, সৃষ্টি হয় বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য। পরবর্তী একশ' বছরে এটি স্পেন থেকে ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম ধর্মে মহম্মদকে শেষ নবী তথা রসুল হিসেকে স্বীকার করা এবং

কোরআনকে আভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিশ্বাস করা—অতি অবশ্যভাবে পালনীয়। কিন্তু যে সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা মানবিক কারণে মহম্মদের হাতে এই ধর্মের সৃষ্টি, সেই সব কারণে এই ধর্মেরও নানা বিভাজন হয়েছে. পরিমার্জনা করার চেষ্টা হয়েছে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মূলত ইমামতের বা নেতৃত্বের তথা ক্ষমতার লড়াই থেকে মুসলিমরা শিয়া ও সুন্নি—এই দুটি বড় ভাগে বিভক্ত হয়। শিযারা সংখ্যালঘু, তারা (হজরত) আলী-র পূর্ববর্তী খলিফাদের খলিফা হিসেবে মানেন না। তাঁদের মতে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরসূরী হলেন তাঁর কন্যা ফতিমা-র স্বামী, হাসান-হোসেনের বাবা এই (হজবত) আলী ইবানু-আবু তালিব-ই। বিষ প্রয়োগে হাসান-এব এবং কারবালার প্রান্তরে হোসেনের নৃশংস মৃত্যুর পর এই বিভাজন আরো তীব্র হয়। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু সুন্নিরা মহম্মদের উত্তরসূরীকে নির্বাচনের মাধ্যমে (elective) ঠিক করার পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। আহনুন সন্নাত-এর নাম অনুসারে এঁদের নাম সুন্নী—এঁরা হাদিস ও প্রচলিত মতবাদ সমর্থন করেন। (হজরত) আলী শিয়া গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা না হলেও, এঁর এবং (হজরত) ফাতিমার বংশধরদের সমর্থকরা মহম্মদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তা সূত্রে যুক্ত (hereditary) কাউকে নেতৃত্বে বসানোর ব্যাপারে আপোসহীন—এঁদের নিয়েই শিয়াগোষ্ঠীর উদ্ভব। শিয়া কথাটির অর্থ দল বা গোষ্ঠী। এঁদের মতে মুসলিমদের প্রধান হবেন ইমাম এবং তিনি হবেন কোন না কোন ভাবে মহম্মদের বংশধর। প্রকৃতপক্ষে পারস্য অঞ্চলের (ইরান) সামন্ত জমিদার ও কৃষক গোষ্ঠীরা ধর্মীয় বাতাবরণে শিয়া নাম নিয়ে আরব বিজেতাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রথমে এই মতপার্থক্য ছিল মূলত রাজনৈতিক তথা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। পরে তাতে ধর্মীয় কিছু কিছু দিকও যুক্ত করা হয়।

ইরানে শিয়ারা সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁদের একাদশ ইমামের কথা অব্দি জানা যায় —কিন্তু ৯ম শতাব্দীতে দ্বাদশ ইমাম নাকি কোথাও আত্মগোপন করেছেন, এখনো করে আছেন এবং একদিন 'মাহ্দি' বা মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এই বিশ্বাস থেকে শিয়ার একটি উপবিভাগ সৃষ্টি হয় এবং এটি ইরানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শিয়ার অন্যান্য বিভাজনের মধ্যে রয়েছে ইসমাইল পন্থা (এর থেকে আগা খান), কারমাথিয়া, ইসমাইল পন্থার পরবর্তী বিভাজন—আসাসিন (Assassin—হাশিশ নামক

দ্রাগটি এঁদের ধর্মানুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; বৈদিক যুগে যেমন ছিল সোমরস), লেবাননের দ্রুজ (Druze) (বর্তমানে ইজরায়েলের শতকরা ১ ৬ মানুষ দ্রুজ) ইত্যাদি।

৮ম-৯ম শতাব্দীতে সুন্নির একটি গোষ্ঠী মুতাজিল-এর সৃষ্টি হয়। এঁরা বলতেন কোরআন শরীফ ঈশ্বরের নয়,—মানুষেরই সৃষ্টি।

তৃতীয় খলিফার আমলে আরেক বিদ্রোহী ইসলামী গোষ্ঠী খাওয়ারিজের জন্ম হয়। ৮ম-৯ম শতাব্দীতে কিছু যুক্তিবোধসম্মত চিন্তাভাবনা দিয়ে ধর্মীয় তত্ত্বের সৃষ্টি হয় মুতাজিলাহ্ নামে। এছাড়া ইসলাম থেকে ইসমাইলপন্থী-বাহাইপন্থী এদেরও সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পাঞ্জাবে মীর্জা গোলাম আহমদ নামে একজন নিজেকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে প্রচার করে ইসলামধর্মের কিছু পরিমার্জনা করেন এবং আহমদিয়া ধর্মমতের সৃষ্টি করেন। এঁরা ইসলাম, খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি নানা ধর্মের মিলনের কথা বলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমরা নিজেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে এলিজা মহম্মদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেন 'নেশান অব ইসলাম'। পরে এর নাম হয় 'ওয়ার্লর্ড কম্যুনিটি অব ইসলাম' এবং সাম্প্রতিকতম নাম 'আমেরিকান মুসলিম মিশন'।

এছাড়া শিয়াগোষ্ঠী থেকে ১০ম শতাব্দীতে পারস্য (ইরান)-এ জন্ম হয়েছিল সুফি মতের —যাতে অতীন্দ্রিয়, রহস্যময় নানা কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ভারতে ইসলামধর্মাবলম্বীরা প্রবেশের সময় এই সুফিরাও এদেশে আসেন। হিন্দুধর্মের ভক্তি আন্দোলন বা গুরুবাদের সঙ্গে এঁদের কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্পষ্ট মিল ছিল। ফলে এদেশে সুফিরা (এবং তাঁদের নেতৃত্বস্থানীয় পীর বা শেখ) নিজেদের বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পান ; এঁদের অনুগামীরা ফকির, দরবেশ ইত্যাদি নামে অভিহিত। হিন্দুধর্মের তথাকথিত নানা গুরু, অবতার বা বাবাজিদের মত এঁরাও সম্মোহন ও আত্ম সম্মোহন (hypnosis and autohypnosis)-এর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে (যেমন, উদ্ভট, রহস্যময় শব্দ করতে করতে নাচতে থাকা যতক্ষণ না আবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হয়—কীর্তন, নামগান ইত্যাদির অনুরূপ) এঁরাও ঐ কল্পিত পরম শক্তি তথা ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন ; সাধারণ সরলবিশ্বাসী মানুষ এঁদেরও এসব কাণ্ড দেখে ভয়ে ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

এছাড়া ইসলাম ধর্মের সাম্যের কথাবার্তা (অর্থাৎ সব মানুষকে সমান ভাবা) এই সুফিরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন ও বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন, পরবর্তীকালের ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা (উলেমা) ঐভাবে করেন নি। ফলে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের কাছে এই সুফিরা জনপ্রিয় ও গ্রহণীয় হন। অন্য দিকে সুফিদের কেউ কেউ প্রচলিত ইসলামধর্মের গোঁড়ামি ও অন্ধ আচারের প্রতিবাদী হিসেবেও তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটান। তবে অধিকাংশই মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জীবন যাপন করেন।

উলেমা অনেকটা হিন্দুদের পুরোহিত স্থানীয়—শাসক সুলতান বা বাদশাব সহায়ক শক্তি। এই উলেমারা পাশাপাশি কোরআন তথা ধর্মের ঊর্ধ্বে ওঠাব জন্য সুলতানের কোন প্রচেষ্টাকেও নিয়ন্ত্রণ কবেন। কোরআনের শরিয়ত এর ব্যাখ্যা এই উলেমারা করেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে, কখনো শুধু নিজেদের স্বার্থে, আবার কখনো উভয়েবই স্বার্থে সাধাবণ মানুষের সামনে শরিয়তের নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

ইসলাম ধর্মে মানবিক দিকই প্রধান। এতে জটিল কোনো আচার পদ্ধতিও নেই। নেই অলৌকিক কাণ্ডকারখানাও। এছাড়াও একই ধর্মাবলম্বী সবাই ভাই-ভাই, সমান—একথাও বলা হয়। আবার অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্বীকারও করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ধনী-দরিদ্রদের বিভেদ ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় ঘটে। ধর্মকে শাসকশ্রেণী ব্যবহার করেই এবং সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসেব সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে—ইসলামধর্মেও তা অনিবার্য-ভাবে প্রতিফলিত। দরিদ্রদের জন্য যে দান তথা 'জাকাত'-এর কথা বলা হয়, তা যায় বাস্তবত মৌলবীদের হাতে। অসংখ্য মুসলিম দরিদ্র ও শোষিত অবস্থায় দিন কাটায়, মুষ্টিমেয় মুসলিম চরম বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের নেশায় বিভোর। সবাই যে ইসলামের নানা নির্দেশ মানেন তাও নয়। যেমন মদ খাওয়া প্রথমের দিকে না হলেও, পরে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু মোগল সম্রাট থেকে হাল আমলের মহম্মদ আলি জিন্না সহ অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, আর ধনী-নির্ধন আরো বহু মদ্যপায়ী মুসলিমের উদাহরণ তো আছেই। প্রয়োজনে ধর্মাচরণে নানা পরিমার্জনাও করা হয়। যেমন, প্রস্রাব-পায়খানার পর জল দিয়ে ভালো করে জায়গাটা ধোওয়া মুসলিমদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়—কিন্তু জল না পেলে ধুলো বা বালি দিয়েও তা করা যায়; নির্দিষ্ট একমাস ধরে উপবাস

(রমজান)-এর কথা বলা হলেও অসুস্থ ব্যক্তি বা ভ্রমণরত ব্যক্তি অন্য কোনো সময়ও এ কাজ করতে পারে।

[অন্যতম জননেতা মহম্মদ আলি জিন্না প্রকৃতপক্ষে ইসলামী রীতি-নীতি ও আচারাদি পুরোপুরি অনুসরণও করতেন না। সরোজিনী নাইডু তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক' বলে বর্ণনা করেছিলেন। সদ্য আফ্রিকা ফেরৎ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সম্বর্ধনাসভার তিনি সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় গান্ধী তাঁকে 'ভারতীয় বন্ধু' নয়, 'মুসলিম গুজরাটি' বলে অভিহিত করায় তিনি অপমানিত বোধ করেন। নাগপুর কংগ্রেসে সব মুসলিম প্রতিনিধি গান্ধীকে 'মহাত্মা' নামে সম্বোধন করেন, কিন্তু জিন্না নন। এর ফলে প্রধানত মুসলিম প্রতিনিধিরাই তাঁকে তীক্ষ্ম বিদ্রূপে জর্জরিত করেন। জিন্না চলে আসেন এবং কংগ্রেসেও আর ফিরে আসেন নি। জিন্নার স্ত্রী ছিলেন পার্সী। কথিত আছে জিন্না কোনদিন নামাজ পড়েন নি। মুসলিম প্রীতির চেয়ে গান্ধী বিরোধিতাই হয়তো তার ইসলামী রাষ্ট্রের দাবির পেছনে বেশি কাজ করেছিল। (**Ansar Harvani, Before Freedom and After, New Delhi,** একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত জিন্নার প্রকৃত মূল্যায়ন যেমন জানা দরকার, তেমনি ধর্ম কীভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাও বোঝা দরকার।]

ইসলামধর্ম সৃষ্টির আগে আরব অঞ্চলে ইহুদি ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত ছিল। এই সব ধর্মের প্রচলিত নানা বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান ইসলাম ধর্মেও অনুপ্রবেশ করেছে—স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা নতুন মতবাদে কিছুটা স্থান পায়ই। খ্রীস্টধর্মেও দেবদেবীর পুজো করা নিষেধ করা হয়। ৭-১০ বছর বয়সে মুসলিম ছেলেদের লিঙ্গমুণ্ড আবরণী ছেদের ধর্মানুষ্ঠান ইহুদিদেরও ছিল (তবে আরো কম বয়সে)। ইহুদিদের মতো মুসলিমদের কাছেও শুকরের মাংস নিষিদ্ধ, ঈশ্বরের ছবি আঁকাও নিষিদ্ধ।

ইহুদি ও খ্রীস্টান—যাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ ছিল, ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে তাঁদের কিছু মর্যাদা দেওয়া হতো। তাদের পরাজিত করা হলেও ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া ছিল এবং আহ্‌ল আলকিতাব (**People of the Book**) নামে অভিহিত করা হয়, তবে মোটা অর্থ কর হিসেবে (জিজিয়া) দিতে হতো। আর মূর্তিপূজক অন্যান্য গোষ্ঠীকে মৃত্যু অথবা ইসলামে ধর্মান্তর গ্রহণের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হতো। কিন্তু

কয়েকটিদেশে মুসলিমদের আনুপাতিক সংখ্যা

পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ১৭·৮ ভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত। এঁরা ছড়িয়ে আছেন ১২৭টি দেশে। এখানে কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার কত ভাগ ব্যক্তি মুসলিম তার পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

দেশ	জনসংখ্যার শতকরা হার
মালদ্বীপ	১০০ (সুন্নি)
ইরান	৯৩ (সিয়া), ৫ (সুন্নি)
ইরাক	৫৩·৫ (শিয়া), ৪২·৩ (সুন্নি)
আরব (UAR)	৭৫·৯ (সুন্নি), ১৯ (শিয়া)
সুদান	৭৩ (সুন্নি)
সোমালিয়া	৯৯·৮ (সুন্নি)
সৌদি আরব	৯৮·৮ (সুন্নি)
কাতার	৯২·৪ (সুন্নি)
পাকিস্হান	৯৬·৭
ওমান	৮৬
মরক্কো	৯৮·৭
মরিটেনিয়া	৯৯ ৪
মালয়েশিয়া	৫২·৯
লিবিয়া	৯৭ (সুন্নি)
কোয়েত	৭৩·২ (সুন্নি), ১৮·৩ (সিয়া)
জর্ডন	৯৩ (সুন্নি)
ইন্দোনেশিয়া	৮৬·৯
মিশর	৯৪·১ (সুন্নি)
কোমোরোস	৯৯·৭ (সুন্নি)
ব্রুনেই	৬৩·৪
বাংলাদেশ	৮৬·৬
বাহরিন	৫১ (শিয়া), ৩৪ (সুন্নি)
আলজেরিয়া	৯৯·১ (সুন্নি)
আফগানিস্তান	৭৪ (সুন্নি), ২৫ (শিয়া)
সিরিয়া	৮৯·৬ (সুন্নি)
টিউনিসিয়া	৯৯·৪ (সুন্নি)
ইয়েমেন (আডেন)	৯৯·৫ (সুন্নি)
ইয়েমেন (সানা)	৬০ (শিয়া), ৪০ (সুন্নি)

উপরের দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়ার সরকারি ধর্ম একেশ্বরবাদ, সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে, আইন ব্যবস্হাও ইসলামী এবং বাকি সব দেশের সরকারি ধর্ম ইসলাম।

কয়েকটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মুসলিম জনসংখ্যা

দেশ	জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ মুসলিম
ভারত	১১.৩৫
আমেরিকা	১ ৯
ইংল্যান্ড	১.৪
ইজরায়েল	১৩.৭ (সুন্নি)
উগান্ডা	৬.৬
রাশিয়া	১১.২
তুর্কি	৯৯.২ (সুন্নি)
ত্রিনিদাদ টোবাগো	৬ ০
টোগো	১২.১
টানজানিয়া	৩৩.০
থাইল্যান্ড	৩.৮
তাইওয়ান	০.৫
সুরিনাম	১৯.৬
শ্রীলংকা	৭.৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১ ৪
সিঙ্গাপুর	১৬.৩ ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে ইহুদি-খ্রীস্টানসহ সমস্ত অ-মুসলিম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই চরম বৈরিভাব গ্রহণ করা হয়, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হিসেবে বলে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ তথা জিহাদের আহ্বান দেওয়া হয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করে, শুধু ধর্ম দিয়ে বিচার করার এই অত্যুগ্র যুক্তিহীনতার নিদর্শন আর কোন ধর্মমতে এত নগ্নভাবে নেই। নিছক একটি বিশ্বাস অন্ধতার পর্যায়ে পৌঁছে মানুষকে কী অমানবিক অবস্থায় নামাতে পারে তার একটি বড় উদাহরণ এটি। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপুল সংখ্যক ধনীদরিদ্র মুসলিমরা এই জিহাদের নেতৃত্ব দেয় না। নেতৃত্ব দেয় তাদের মুষ্টিমেয় শাসককুল—ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লাগায়। আরবের বিশাল অঞ্চলে

আধিপত্য করা, একচেটিয়া ব্যবসা করা ও নতুন রাজ্য দখল করার যে-সব দিক ইসলামধর্মের জন্ম থেকেই তার সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে মিশে আছে (অথবা এসবের উদ্দেশ্যেই এই ধর্মের ঐতিহাসিক সৃষ্টি), তার থেকে এই জিহাদ অপ্রাসঙ্গিক মোটেই নয়।

শুধুমাত্র নিজের ধর্মাবলম্বীদের তবু কিছুটা আপন ভাবা হয়—যদিও একই ধর্মাবম্বীদের মধ্যেও শাসক-শোষিত বা ধনী-দরিদ্রদের অস্তিত্বও ধর্মানুমোদিত। বলা হয়েছে—"এবং তিনিই হাসাইয়া থাকেন ও কাঁদান, এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান ..ধনী গরীব করেন...।" শেষ বিচারের দিনের কথা বলা হয়, যেদিন ঈশ্বর অন্যায়কারীর বিচার করবেন। হিন্দুদের মতো পূর্বজন্ম বা কর্মফলের কথা না বললেও এই শেষ বিচারের বা স্বর্গ-নরকের বিশ্বাসে দরিদ্র, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত মুসলিমরা মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন। "নিশ্চয়, নেক্‌কার মানুষেরা বেহেশতে সুখে নিয়ামতের মধ্যে থাকিবে, এবং পাপীরা নিশ্চয়ই দোযখের মধ্যে থাকিবে।"

ইসলামে মেয়েদের সম্পত্তির ভাগ দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন আরব এক-একজন ধনী ব্যক্তি অসংখ্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচার চালাত। মহম্মদ শুধু চারটি বিয়ের কথা বলেন (লক্ষ্যণীয় প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনিও চারটিই বিয়ে করেন)। তবে শর্ত—সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে—যা বাস্তবত অসম্ভব। ইসলামে আত্মহত্যা করা (এবং ফলশ্রুতিতে সতী হওয়া) অধার্মিক কাজ।

তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী, কোরআনেও নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্বের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সতীত্বের কথা বলা হয়েছে। 'পুরুষের নারীর ওপর কর্তৃত্ব আছে, কেন না আল্লাহ্ তাহাদের একজনকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাহাদের জন্য) নিজের ধন ব্যয় করে। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুম মত চলিবে এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহর হেফাজতে (মান-ইজ্জত) রক্ষা করিবে। আর যে-নারীদের কু-স্বভাবের আশংকা কর, তাহাদিগকে নসীহত কর ; (যদি না মানে) তাহাদের সহিত এক শয্যায় শয়ন বন্ধ কর, এবং (তাহাতেও যদি সংশোধন না হয়) তবে তাহাদিগকে প্রহার কর। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের কথা মান্য করে, তবে তাহাদের ওপর অত্যাচারের বাহানা খুঁজিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও মহান।' অর্থাৎ নারীরা যেন পুরুষদের গৃহপালিত

পশুবিশেষ! এবং এই মানসিকতা থেকেই হয়তো নারীদের প্রতি করুণা করা, সম্ভ্রম দেখানো, সম্পত্তির ভাগ দেওয়া এসবের কথাও বলা হয়েছে।

কোরআনের নানা নির্দেশের নানা ধরনের ব্যাখ্যাও করা হয়। এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার অনেক কিছুই স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে (যেমন মহম্মদের সময়েই ইহুদিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মদ্যপান সহ কিছু কিছু সংযোজন-পরিমার্জনার প্রয়োজন হয়েছিল)।

আগেই বলা হয়েছে এই ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের অনেক আচার-অনুষ্ঠানই ইসলাম ধর্মে তথা কোরআন শরিফে স্থান পেয়েছে। ইসলামের পূর্বসূরী ইহুদীধর্ম (Judaism)-এ বেশ কিছু বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন, শুয়োর, উট, খরগোস ইত্যাদির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যাযাবর ইহুদিদের শত্রু স্থানীয়রা (কৃষিজীবী) শুয়োর পুষত। শত্রুদের গৃহপালিত জন্তু তাই ঘৃণ্য বা অখাদ্য হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল। উট ছিল খুবই উপকারী প্রাণী—যা মরুবাসীদের অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য ছিল। রক্তযুক্ত প্রাণীমাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কারণ রক্তকে ভাবা হত দেহের আত্মা। লিঙ্গ মুণ্ডচ্ছেদ (circumcision)-এর নিয়মও ইহুদিদের মধ্যে চালু ছিল। এমনি ধরনের নানা স্থানীয় ইহুদি আচারের কিছু কিছুকে আর এড়ানো যায় নি,—সেগুলি মুসলিমদেরও আচারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু (হজরত) মহম্মদের নেতৃত্বাধীন মুসলিমদের কাছে ক্ষমতার প্রশ্নে ইহুদিরা ছিল শত্রুস্থানীয়। তাই একসময় স্থানীয় এই প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠী সম্পর্কে শত্রুতামূলক নির্দেশ কোরআন শরিফে অনুপ্রবেশ করেছে যেমন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না ; তাহারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে তাহাদেরই একজন হইয়া যায়…". "নিশ্চয়, আমি কাফিরদের জন্য শিকল গলার বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখিয়াছি"ইত্যাদি ইত্যাদি।

'পবিত্র কোরানে'র এই সব নির্দেশ গত দেড়হাজার বছর ধরে কিছু মানুষ অনুসরণ করছেন। এর সৃষ্টির সামরিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ছিল প্রকট। অন্যদিকে ইসলামের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত যাযাবর মানুষদের, শহরের মানু. ও ব্যবসায়ীদের—সবার স্বার্থই কমবেশি দেখা হয়েছে। আবার অনেকের মতে এটি মূলত ছিল শহরের অভিজাত ও ধনীদের

বিরুদ্ধে যাযাবর বেদুইনদের ক্ষমতা ও জায়গা দখলের লড়াই। ভিন্ন মতে, মহম্মদের সামাজিক ভিত্তি ছিল মদিনার দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষরা—পরে বেদুইনরা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্দোলনে নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক গবেষক, ইসলামধর্মের মধ্যে মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। এঙ্গেলস-এর মতে, ইসলামধর্ম একদিকে শহরবাসী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, অন্যদিকে যাযাবর বেদুইন গোষ্ঠী—উভয়েরই স্বার্থবাহী ছিল।

ইহুদি ধর্ম

প্রস্তর যুগের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষ নিজেদের পরিবেশ-পরিস্থিতি আর কল্পনার বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর কল্পনা ও আরাধনা করেছে। যত দিন গেছে, ততই এ ধরনের দেবদেবীর সংখ্যা বেড়েছে—একই সঙ্গে বেড়েছে তাদের ঘিরে ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব। কিন্তু যখন শাসকগোষ্ঠী সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এরা দেখেছে বিপুল সংখ্যক মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শাসন করার ক্ষেত্রে এই তথাকথিত ধর্মীয় গোষ্ঠীভেদ অসুবিধার সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই ছিল। সব মিলিয়ে প্রয়োজন হয় সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে একেশ্বরবাদ সৃষ্টির। এর ফলে একটিমাত্র কল্পিত উপাস্যের আধ্যাত্মিক বলয়ের মধ্যে বিপুলতর সংখ্যক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তথা শাসন করা যায়। ইসলাম ধর্মে এই একেশ্বরবাদ তথা নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সম্পৃক্তভাবে মিশে আছে। কিন্তু তার আগে সৃষ্টি হওয়া ইহুদি ধর্ম এক্ষেত্রে পূর্বসূরি। খ্রীস্টপূর্ব দুই থেকে দেড় হাজার বছর সময়কালে আরবের উত্তরে ইজরায়েল অঞ্চলে ইহুদি ধর্মের (Judai-m) সূচনা হয়। শুরুতে অবশ্য একেশ্বরবাদের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গাছপালা, পাহাড় পাথর, ঝর্ণা, এমনকি পাথরের থাম—এ-সবেরও পূজো করা হতো। এরপর ধীরে ধীরে ইহুদিদের দেবতা ইয়াহুয়া (Yahweh)-এর কল্পনা পল্লবিত হয়। (আগে ভুলভাবে একে জিহোবা বা Jehovah নামে অভিহিত করা হতো।)

ইজরায়েল, প্যালেস্টাইন তথা আরব অঞ্চলে নানা রাজ্য, শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে ক্ষমতা ও রাজ্য দখলের লড়াই চলে। অবিশ্রান্ত

রক্তপাতের ঐ পরিবেশে ইয়াহ্ুয়াও ইজরায়েলের তথা ইহ্ুদিদের সামরিক শক্তির অধিষ্ঠাতা দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহ্ুদিদের নানা ধর্মীয় অনুশাসনের স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত মোজেস, এর দেখা পান বলে কথিত আছে। মিশরের সীমান্ত এলাকায় সিনাই অঞ্চলে হোরেব পাহাড়ে এই দর্শন ঘটে বলে বলা হয়। ইয়াহ্ুয়ার কল্পনাও সম্ভবত এসেছে এই এলাকার আদিবাসীদের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে ইজরায়েলের যাযাবর ইহ্ুদিরা প্যালেস্টাইনের কৃষি অঞ্চল দখল করা শ্রু করে—এই সময়েই ইয়াহ্ুয়াকে য্ুদ্ধের দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে ইহুদিদের শতকরা ভাগ

দেশ	শতকরা ভাগ
ইজরায়েল	৮১.৬
উরুগুয়ে	১.৭
আমেরিকা	২.৭
ইংল্যাণ্ড	০.৮
রাশিয়া	১.১ (১৯৮৯ সালের হিসাব)
নেদারল্যাণ্ডস অ্যান্টিলিস	০.১
ইরান	০.৩
চিলি	০.২
কানাডা	১.১
ব্রাজিল	০.১
অস্ট্রিয়া	০.১
অস্ট্রেলিয়া	০.৪
আরুবা	০.২
অ্যাঙ্গোলা	০.৪
প: জার্মানি	০.১ ইত্যাদি

করা শ্রু হয়। ধারণা করা হয় এর উদ্দেশ্য ছিল দেবতা তথা ধর্মবিশ্বাসের নাম করে মানুষের মধ্যে য্ুদ্ধের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করা তথা অন্যদের হত্যা করে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে নীতিবিরুদ্ধ নয়, বরং ঈশ্বরের অভিপ্রায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সলোমন জেরুজালেমে ইয়াহ্ুয়ার বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের রাজা জেরুজালেম অধিকার করে নেন। ৫৩৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পার্সিয়ার সাইরাসের অধীনে ব্যাবিলনের দাসত্ব থেকে ইহ্ুদিদের মুক্তি ঘটে এবং জেরুজালেমের মন্দির পুনর্গঠন করা হয়। আর এই সময়-

কালেই ইহুদিধর্ম তার চূড়ান্ত রূপ পায় এবং কঠোরভাবে একেশ্বরবাদ অনুসরণের কথা বলা হয়, ধর্মগ্রন্থগুলিকে সুসংহত, চূড়ান্ত রূপ দিয়ে তাকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় (Canonisation)।

জুডিয়ার রাজা জোসিয়া (খ্রী. পূ. ৬২১) সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইহুদিধর্মের অনুশাসনগুলিকে স নির্দিষ্ট করেছিলেন। আসিরিয়া, মিশর ও ব্যাবিলনের দ্বারা ইহুদিদের মাতৃভূমি ইজরায়েল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার সময় ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নৈতিকভাবে সাহসী করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সময়েই মোজেস-এর পঞ্চম বই (Fifth Book) তথা ডয়টরেনমি (Deuteronomy) লেখা হয়—এতে দাসত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে আইন ইহুদিধর্মের আনুষ্ঠানিক নিয়মগুলি ও আইনগত অন্যান্য নানা বিষয় রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতা স্থাপন। জোসিয়া জেরুজালেমের মন্দির থেকে অন্য দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন, একমাত্র ইয়াহুয়ার আরাধনার কথা বলেন।

বাইবেল কথাটির অর্থ বই। ইহুদিদের এ-সব বইকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে রয়েছে নিয়মকানুনের ও নির্দেশাবলীর কথা। জেনেসিস (ঈশ্বর কীভাবে পৃথিবী, মানুষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে তার গল্প, নোয়ার কথা রয়েছে এতে), এক্সোডাস (মোজেস-এর জীবনী, বিখ্যাত টেন কম্যান্ডমেন্টস ও অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশ এবং মিশরীয়দের অধীনতা থেকে হিব্রুদের তথা ইহুদিদের মুক্তির কথা রয়েছে এতে), লেভিটিকাস (ধর্মীয় আইন), নাম্বারস (মিশর থেকে চলে আসার পরেকার ইতিহাস ও বিধিনেষেধ আছে এতে), ডয়টেরনমি (ধর্মীয় আইন) এবং জোশুয়ার বই, Book of Joshua (Nun- এর ছেলে জোশুয়ার নেতৃত্বে ইহুদিরা কীভাবে প্যালেস্টাইন তথা Land of Canaan অধিকার করল তার কথা রয়েছে এতে)—এই সবগুলি এই প্রথম ভাগটির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ঐতিহাসিক বই—জাজেস, রুথ, স্যামুয়েল, প্যারালিপোমেনন (ক্রনিকলস), এজরা, নেহেমিয়া, এস্থার জোব, রাজা ডেভিড ও সলোমন ইত্যাদির বই। তৃতীয় ভাগে আছে তথাকথিত ঈশ্বরের দূতেদের বই—ইসাইয়া, জেরেমিয়া, এজেকিয়েল, ডানিয়েল এবং আরো বারোজন ছোট ছোট দেব-দূতের বই। এ সবগুলিই ইহুদিধর্মের সৃষ্টির নানা পর্যায়ে লেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে সৃষ্টি হওয়া খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা

বাইবেলের এসব বইকে একত্রে ওল্ড টেস্টামেণ্ট হিসেবে অভিহিত করেন। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে নিউ টেস্টামেণ্ট, ইহুদিরা একে স্বীকার করেন না।

বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র ০'৩ ভাগ মানুষ ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং কম-বেশি সংখ্যায় এঁরা ছড়িয়ে আছেন ১২৫টি দেশে। কিন্তু যখন খ্রীস্টধর্ম বা ইসলাম কোনোটিরই সৃষ্টি হয় নি, তখন এই ইহুদিধর্মই ছিল ব্যাপক একটি ধর্মবিশ্বাস এবং এর থেকেই বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম এই দু'টি ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলা যায় ; ওল্ড টেস্টামেটের বহু তত্ত্ব, ধর্মীয় আচার, ঘটনা বা কল্পনা খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামাজিক নানা পরিবর্তনের সঙ্গে কীভাবে মানুষের তৈরী করা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তিত-রূপান্তরিত হয় তার একটি বড় উদাহরণ ইহুদিধর্ম। এবং এর সঙ্গে যুক্ত খ্রীস্টধর্ম সৃষ্টির উদাহরণটিও।

খ্রীস্টধর্ম

বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যার বিচারে বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম হচ্ছে খ্রীস্টধর্ম। অবশ্য হিন্দু-ইসলাম ইত্যাদি সব ধর্মের মতোই এই ধর্মাবলম্বীরাও নানা সময়ে নানাভাবে বিভক্ত হয়েছে—সামাজিক-অর্থনৈতিক-আধ্যাত্মিক স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে। খ্রীস্টধর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতাদর্শগতভাবে যেমন ইহুদিধর্ম তথা ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রভাব ছিল, তেমনি রাজনৈতিকভাবে রোমান সাম্রাজ্যের সৃষ্টি একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত রোম সাম্রাজ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ দাস হিসেবে, এবং বিপুলতর সংখ্যার মানুষ দাস না হয়েও নিপীড়িত জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। এদের একাধিক বিদ্রোহ অত্যাচারী রোম সম্রাট ও তার অনুগত মুষ্টিমেয় আমলাদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে।

এই সময় বিপুলতর সংখ্যার সাধারণ মানুষের কাছে এমন একটি ধর্মমতের প্রয়োজন হয়, যেটি তাদের এই অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে সাহসী করে তুলবে। দৃঢ়মূল ঈশ্বরবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এমন একটি তত্ত্বের প্রয়োজন হয়, যেটি নিপীড়িত মানুষকে একটি উদার ছত্রচ্ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করবে। রোমান শাসকদের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা হয়েছিল—রোম শহরের দেবতা রোমা (Roma) ও জুপিটার (Jupiter Capitolius)-এর আরাধনার কথা বলা হয় এবং সবাইকে তা মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। রোমান সেনাদের মধ্যে পারস্য (ইরান)

এর মিথ্রো মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এদের কোনোটিই বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত মানুষের সামনে মুক্তির আশ্বাস নিয়ে আসে নি। এবং এমনই পরিস্থিতিতে খ্রীস্টধর্মের সৃষ্টি।

খ্রীষ্টধর্ম (Christianity) কথাটি এই প্রচলিত অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন অ্যাণ্টিওক-এর বিশপ ইগনাটিয়াস (মৃত্যু ঃ ১১০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর 'লেটার টু দি ম্যাগনেসিয়ানস'-এ। (খ্রীস্টপূর্ব-খ্রীস্টাব্দ জাতীয় কথাগুলি অবশ্য ঐ সময় এমনভাবে ব্যবহার করা হতো না—ইয়োরোপের মধ্যযুগে এ ধরনের শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।)

এই ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে নাজারেথ-এর যীশু- (Jesus of Nazareth)-এর কথা বলা হয়। কিন্তু গীর্জা ও যাজকরা যীশুর জীবনকে ঘিরে এমন একটা আধ্যাত্মিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর সত্যিকারের জীবন-ইতিহাস জানা দুঃসাধ্য। তবু মোটামুটি বলা যায়, তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৬ সালে জুডিয়াতে জন্মান ও ৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ম্যাথিউ ও লিউক-এর দেওয়া বর্ণনায় অবশ্য সামান্য অন্যরকম তথ্য পাওয়া যায়।

খ্রীস্টানদের যীশু-র জন্মের অনেক আগে থেকেই প্যালেস্টাইনে যীশু নামে এক দেবতার (God Jesus) কথা বলা হতো। অনেকের মতে এটিই পরে কল্পনায় বিশেষ মানুষ সম্পর্কে আরোপিত হয়। খ্রীস্টধর্মের প্রচারক হিসেবে পরিচিত যীশু নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা, এ-ব্যাপারে তাই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ সন্দেহ আরো বাড়ে যখন দেখা যায়, কুমারী মেয়ে মেরি-র সঙ্গে ঐশ্বরিক মিলনের ফলে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে বলা হয়। এ-ধরনের আধ্যাত্মিক কল্পনা অবশ্য খ্রীস্টানদের মধ্যেই নয়, টোটেমপন্থী নানা আদিম মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যেই এর সৃষ্টি, পরবর্তীকালে নানা ধর্মে এর প্রতিফলন ঘটেছে—যেমন তথাকথিত হিন্দুদেব অপূর্ব গল্প রামায়ণ-মহাভারতে এ ধরনের ঐশ্বরিক ঔরসে সন্তানলাভের কথা আকছারই বলা হয়েছে। তবে যে-ইহুদিধর্ম (Judaism) খ্রীস্টধর্ম সৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা অস্বীকৃত। তাই খ্রীস্টধর্মের তথাকথিত ধর্ম-পুস্তকগুলিতে যে-সব গল্প-গাথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচ্যের কিছু প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। খ্রীস্ট (Christ) কথাটি ইহুদি শব্দ মেসায়া অর্থাৎ পরিত্রাতার গ্রীক অনুবাদ। ইহুদিদের কাছে মেসায়া ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন। খ্রীস্টানদের কাছে যীশু-ই এই পরিত্রাতা অর্থাৎ খ্রীস্ট।

যীশু সম্পর্কে প্রচলিত নানা গল্প-গাথায় অনেক সময় মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন সেণ্ট ম্যাথ্যু ও সেণ্ট লিউক উভয়েই তাঁদের মঙ্গলবার্তায় (Gospel) যীশুকে রাজা ডেভিডের বংশধর বলেছেন। কিন্তু সেণ্ট ম্যাথ্যুর মতে তিনি রাজার ২৮তম বংশধর, অন্যের মতে ৪২তম। সেণ্ট ম্যাথুর মতে যীশুর ঠাকুরদার নাম জেকব, সেণ্ট লিউকের মতে এলিজা। সেণ্ট ম্যাথ্যু বলেছেন, যীশুর মা ও বাবা (অর্থাৎ জাগতিক বাবা জুডিয়ার শহর বেথলহেম-এ থাকতেন; রাজা হেরড সব নবজাত শিশুকে হত্যার আদেশ দিলে, যীশু জন্মানোর পর তাঁরা মিশরে পালিয়ে আসেন। হেরড মারা গেলে তাঁরা সপরিবারে গ্যালিলিয়ার শহর নাজারেথ-এ চলে আসেন। অন্যদিকে সেণ্ট লিউক বলেছেন, যীশুর বাড়ির লোকজন বরাবরই নাজারেথ-এ থাকতেন, শুধু যীশু যখন জন্মান তখন বেথলহেম-এ ছিলেন; তারপর তাঁরা আবার নাজারেথ-এ ফিরে আসেন।

হিন্দুধর্ম সহ অন্যান্য প্রায় সব ধর্মের মতো (অন্যতম কিছু ব্যাতিক্রম ইসলাম ও মহম্মদের জীবন) খ্রীস্টধর্মেও যীশুর জীবনকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গল্প হিসেবে এগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষাপ্রদও বটে। তবু যীশুর হাতের ছোঁয়ায় দুরারোগ্য রোগ ভালো হয়ে গেল বা জন্মান্ধ দেখতে পেল, কিংবা যীশু জলের উপর হেঁটে গেলেন, এগুলি স্পষ্টতই অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের অন্যতম চিরাচরিত কৌশল মাত্র।

খ্রীস্টধর্মের স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থকে চারভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম ভাগে রয়েছে সেণ্ট ম্যাথ্যু, সেণ্ট লিউক, সেণ্ট মার্ক ও সেণ্ট জন-এর লেখা চারটি গসপেল। এতে যীশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে সেণ্ট জন-এর গসপেলটির সঙ্গে অন্য তিনটির আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে খ্রীস্টধর্মে প্রথম ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের কথা (proselytisers)। তৃতীয়ভাগে রয়েছে তথাকথিত ঈশ্বরের দূতেদের লেখা (epistles of apostles)। চতুর্থটি হচ্ছে সেণ্ট জন-এর দি রিভিলেশন। এই সবগুলিকেই একত্রে নিউ টেস্টামেণ্ট বলা হয়।

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে এগুলি লিখেছে। যীশু নামে সত্যিই কেউ থেকে থাকলে তাঁর মৃত্যুর পর এগুলি লেখা—দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে নয়। তার আগে মৌখিকভাবে এগুলি চালু ছিল। আর এ-সবের লেখকরা

বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল ছিলেন না। যেমন প্যালেস্টাইনের শুয়োরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ইহুদিরা অপবিত্র ভেবে শুয়োর পুষতই না। আবার সর্ষে গাছকে ডালওয়ালা বিশাল গাছ হিসেবে বলা হয়েছে, যা হাস্যকর। রাজা হেরড ও সিরিয়ার শাসক কুইরিনিয়াস-এর সময়কালকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে —অথচ এঁদের সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় এক হাজার বছর। লেখাগুলির অধিকাংশই যে কল্পনাশ্রয়ী ছিল তাও এ-থেকে বোঝা যায়।

যাই হোক সব মিলিয়ে এটিই প্রচলিত যে, যীশু নিপীড়িত মানুষ ও দাসেদের সামনে একটি নতুন মানবতাবাদী মতাদর্শ প্রচার করেন। তাঁর অনুগামীদের প্রথমে নাজারিন নামে অভিহিত করা হতো। শুরুতে বিরুদ্ধবাদীরা ব্যঙ্গার্থে বা গালাগাল করার উদ্দেশ্যে তাঁদের খ্রীস্টান বলতেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকে এই নতুন ধর্মমতে বিশ্বাসীরা নিজেরাই নিজেদের খ্রীস্টান বলে অভিহিত করতে থাকেন।

যীশুর আগে ব্যাপটিস্ট জন প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্মের নীতিমালার প্রচার করেন, এবং যীশুকে ব্যাপটাইজ করেন। 'পবিত্র' নামে চিহ্নিত জল গায়ে ছিটিয়ে এই ধর্মানুষ্ঠান ইহুদিদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পরে খ্রীস্টধর্মে অনুপ্রবেশ করে। জন ঈশ্বরের রাজ্যের কথা, পাপের জন্য অনুতাপ করার কথা ইত্যাদি বলেছিলেন। কিন্তু এই ঈশ্বরের রাজ্য জাতীয় কথাবার্তা স্পষ্টতই রাজা তথা শাসককুলের পছন্দসই ছিল না। জন বন্দী হন। এবং যীশু তার আরব্ধ কাজ কাঁধে তুলে নেন।

যীশু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে ঈশ্বরের কথা বলতে থাকেন। সমাজের তথাকথিত উচ্চ-নীচ ভেদ না করে. তিনি সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে অভিহিত করেন এবং খুব সহজ সরল ভাষায় নীতিমালা শিক্ষা দিতে থাকেন। নিজের প্রতিনিধি হিসেবে সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নেন, যেমন, অ্যান্ড্রু, পিটার, জেমস ও জন ছিলেন জেলে, ম্যাথু ছিলেন ট্যাক্স কালেক্টার ইত্যাদি। প্রথমে তিনি গ্যালিলির সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন। তারপর জেরুজালেমে যান (পাসওভার)। এখানেই রোমান আইন অনুসারে তাঁকে রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। মার্ক ও লিউকের মতে, এর আগে বিচারের সময় যীশু নিজেকে মেসায়া বা

খ্রীস্ট বলে দাবি করেন। তাই তাঁর ওপর মৃত্যুদণ্ড নেমে আসে। তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক নানা তথ্যে ভক্তদের বিবরণে গরমিল থাকলেও তিনি যে শুক্রবার মারা যান তা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত এবং এ তারিখটি সম্ভবত ৭ এপ্রিল (৩০ খ্রীস্টাব্দ)।

খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে ক্রুশ চিহ্ন একটি পবিত্র জিনিস হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেকের ধারণা যীশু যেহেতু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান, তাই ক্রুশ সম্পর্কে এ রকম ধারণা জন্মেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য তা নয়। রোমানরা যে ক্রুশে বিদ্ধ করে মানুষ মারত সেটি ইংরেজি 'টি' (T) অক্ষরের মতো—তার তিনটি বাহু। কিন্তু 'পবিত্র' ক্রুশ-এর চারটি বাহু। এবং প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্ম প্রচলিত হওয়ার আগে থেকেই প্রাচীন চীন, প্রাচীন ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাছে এ-জাতীয় চিহ্ন পবিত্র হিসেবে গণ্য হতো। ভারতীয় হিন্দু বা আর্যদের কাছে তার একটি রূপান্তরিত পর্যায় হচ্ছে স্বস্তিকা চিহ্ন। মিশর, ক্রীট ও অন্যান্য অঞ্চলের অতি প্রাচীন শিল্পকর্মের মধ্যেও পবিত্র বা ঐশ্বরিক হিসেবে ক্রুশ-এর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের চিহ্ন কেন পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়েছে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। তবে অনেক গবেষকের মত হলো আগুন জালানোর সময় কাঠের টুকরো আড়াআড়িভাবে রাখার পদ্ধতি থেকে এ ধরনের চিহ্নকে আগুনের প্রতীক ও পরে পবিত্রতা বা ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার অনেকের মত সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখে এ চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতে এটি যৌনতা তথা উর্বরতার প্রতীক। উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা এরকম ক্রুশ চিহ্নের চারটি প্রান্তকে পৃথিবীর চারদিক (পৃথিবীকে চতুষ্কোণ হিসেবেই কল্পনা করা হতো) বলে ভাবত ও পুজো করত। উৎস যাই হোক না কেন এবং কাঠ, লোহা, সোনা, রুপা ইত্যাদি যা দিয়েই বানানো হোক না কেন, ক্রুশচিহ্ন শত-শত বছর ধরে নিছক মানুষেরই হাতে প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। তাকে আলাদাভাবে পবিত্র ভাবার মধ্যে ঐশ্বরিক কোনো ব্যাপার নেই। তথাকথিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের কবরখানায় শুরুর দিকে এমন আবশ্যিকভাবে ক্রুশ রাখাও হতো না—বরং ভেড়ার ছানা, কাঁধে ভেড়া নিয়ে মেষপালক, মাছ ইত্যাদির ছবি বা মূর্তি রাখা হতো। পরবর্তীকালের কবরখানায় বিভিন্ন আকারের ক্রুশ-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তখনো ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি আসে নি। কেবলমাত্র

অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে এমন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি ও মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

যাই হোক খ্রীস্টধর্ম শুরুর দিকে ইহুদি ও আদিবাসী অন্যান্য গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে প্রায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু খ্রীস্টধর্মের মৌলিক দিক হচ্ছে পাপ-এর ধারণা, এবং পাপ থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভের ধারণা (salvation)। পাশাপাশি সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান ভাবা ও ভাই হিসেবে ভাবা—এসব উদারনৈতিক মানবতাবাদী কথাও ছিল। অপরাধ স্বীকার করা, প্রার্থনা করা, সহ্য করা, ক্ষমা ও আনুগত্য—এগুলির কথাও বলা হয়।

এর ফলে নিপীড়িত মানুষ তার দারিদ্র ও দুর্দশার একটা 'যুক্তিগ্রাহ্য' ব্যাখ্যা খুঁজে পেল, ধনী-দরিদ্র বিভাজন যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত—এসব ভেবে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে লাগল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হিসেবে বিপজ্জনকভাবে এই সহজ পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, নিজের পাপক্ষালনের চেষ্টা করার মধ্য দিয়েই মুক্তি আসবে। সামাজিক কারণ নয়—আমার দুর্দশার জন্য আমার পাপই দায়ী—এমন ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করা হলো এবং এখনো করা হচ্ছে। তথাকথিত মিশনারী সম্প্রদায় দেশে-বিদেশে এখনো খ্রীস্টধর্মের মানবপ্রেমের কথাবার্তার সঙ্গে সুন্দরভাবে এই তত্ত্বকে মিশিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে সামাজিক যেসব কারণ বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়নের জন্য দায়ী সেগুলিকে খুঁজে বের করা এবং তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালানোর প্রচেষ্টাকে ভোঁতা করে দেওয়া যায়। প্রায় সমস্ত প্রচলিত ধর্মই শাসকশ্রেণীর সুবিধাজনক এই জাতীয় তত্ত্ব জানিত বা অজানিতভাবে প্রচার করেছে—খ্রীস্টধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক অন্যায়গুলিকে দূর করার মধ্য দিয়ে নয়, মুক্তিদাতা যীশুর নির্দেশ অনুসারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেই মুক্তিলাভ হবে, এ-জাতীয় কথাবার্তার বড় বিপদ এখানেই। সত্যিই যদি তাই হতো, তবে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্তত এই দু-হাজার বছরের পরেও দারিদ্র, বঞ্চনা, বৈষম্য ও নিপীড়ন থাকার কথা ছিল না ; এবং তারও ব্যাখ্যা ঐ মানবজাতির আদিম পাপ—এমন সর্বনাশা তত্ত্ব।

যীশু নামে সত্যিই যদি কেউ জন্মে থাকেন, তবে তিনি যেমন অস্তিত্ব-হীন ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন—সামাজিক কারণেই তাঁর ও তাঁর মতাদর্শের সৃষ্টি ও জনপ্রিয়তা, তেমনি পরবর্তীকালে নিছকই সামাজিক ও মনুষ্যসৃষ্ট

কারণেই তাঁর মতাদর্শের বিভাজন, পরিমার্জন হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এমন একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে নস্টিক (Gnostic) নামে ; এদের কাছে ইহুদিরা একেবারেই পরিত্যাজ্য ছিল, কিন্তু খ্রীস্টধর্মে ইহুদিদের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। নস্টিক মতবাদ মূলত ধনী অভিজাতদের চিন্তাভাবনা ছিল, প্রধানত এ-কারণেই এর সর্বজনীনতা সম্ভব হয় নি। তবে নস্টিকদের কিছু চিন্তার প্রতিফলন পরবর্তীকালের খ্রীস্টধর্মের মধ্যে ঘটে। প্রায় এই সময়েই মণ্টানিস্ট (Montanist) আন্দোলনও গড়ে ওঠে, যেটিতে চার্চের ও বিশপদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়! দাস-মালিকদের স্বার্থের উপযোগী ছিল এ ধরনের আন্দোলন এবং খ্রীস্টধর্মের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সর্বজনীনতাকে এটিও আটকাতে পারে নি। তবে এই সময়কালে খ্রীস্টধর্মের ধারক ও বাহক হিসেবে ধনী ব্যক্তিরাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল। মণ্টানিস্টদের আন্দোলন ঠেকাতে এরা বিশপদের সঙ্গে যীশুর তথা ঈশ্বরের দূতের ধারাবাহিকতার কথা প্রচার করতে শুরু করে।

তৃতীয় শতাব্দীতে বিশেষত পারস্য অঞ্চলে খ্রীস্টধর্ম ও জোরোঅ্যাস্ট্রিয়ান-বাদের সমন্বয়ে মানিকিয়া গোষ্ঠী (Manichaean sect) গড়ে ওঠে। চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষত উত্তর আফ্রিকায় বিশপ ডোনেটাসের নেতৃত্বে ডোনাটিস্টদের উদ্ভব হয়। এরা সরকারের সঙ্গে কোনোধবনের সহযোগিতার বিরোধিতা করেন, বিশপ ও যাজকদেরও অস্বীকার করেন। এটি ধনীদের বিরুদ্ধে দরিদ্রদের সরাসরি বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয় এবং অ্যাগোনিস্ট নাম ধারণ করে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহী মতবাদের বিলুপ্তি ঘটে।

চতুর্থ শতাব্দীতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার যাজক আরিয়স-এর নেতৃত্বে খ্রীস্টধর্মের উৎপত্তি তথা যীশুকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে ভাবার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। দুপক্ষে দাঙ্গাও ঘটে। গোঁড়া খ্রীস্টানরা আরিয়সকে সবচেয়ে পাপী শয়তান হিসেবে অভিহিত করলেও বেশ কিছুকাল ধরে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রসারিত হতে থাকে - যার একটি বিভাজনের কিছু ছাপ ক্যাথলিক ধর্মমতে পাওয়া যায়। আরিয়স-এর পরাজয়ের পরে-পরেই প্রায় একই ধরনের বিদ্রোহী মানসিকতা নিয়ে কনস্তানতিনোপলের বিশপ, নেস্টো-রিয়াসের নেতৃত্বে আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। যীশুখ্রীস্টকে তিনি মানুষ হিসেবেই গণ্য করেন, ঈশ্বর বা তাঁর দূত নয় ; কুমারী মেরি তাঁর মতে

যীশুর জন্মদাত্রী মাত্র। নেস্টোরিয়াসের মতবাদ পরে ব্যাপকতা লাভ না করলেও এখনো দক্ষিণ ভারত, লেবানন ইত্যাদি এলাকার কিছু কিছু ক্ষুদ্র খ্রীস্টান গোষ্ঠী এই মতাবলম্বী।

এই ধরনের বিদ্রোহী মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যীশুকে পূর্ণ অর্থে দেবতার আসনে বসিয়ে মনোফাইসিট (Monophysite) মতবাদের জন্ম হয়। বিশপ ইউটিকাস-এর প্রচারিত এই মতাদর্শ রোমসাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের মানুষের স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে আর্মেনিয়ান চার্চ, আবিসিনিয়ার কিছু মানুষ এই মতবাদে বিশ্বাসী।

খ্রীস্টধর্মের শুরুর দিকে আচার-অনুষ্ঠান খুবই কম ছিল, ছিল সহজ সরল পদ্ধতি। পুরনো নানা ধর্মমতগুলিতে এ ধরনের নানা অনুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষে মানুষে বিভাজন করা হতো—খ্রীস্টধর্মের সারল্য এই বিভাজন দূর করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কম্যুনিয়ম, ব্যাপটিজম, ইস্টার ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান চালু হয় দু-তিন শ' বছরের মধ্যেই। এগুলি প্রায় সবগুলিই স্থানীয়ভাবে প্রচলিত নানা অনুষ্ঠানের প্রতিফলিত রূপ। যেমন স্নান করে পাপ দূর করা, জল ছিটিয়ে শরীর পবিত্র করা ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীর মধ্যেই চালু ছিল। এরই পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মের নামে গোঁড়ামি আর পাশবিক কাজকর্মও ছড়াতে থাকে। নব্য খ্রীস্টানরা তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার নির্বোধ তাড়নায় ৪১০ খ্রীস্টাব্দে রোমের শিল্প ও বিজ্ঞানের নানা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ওয়েস্ট গথদের নেতৃত্বে। ৪১৫ খ্রীস্টাব্দে প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল-এর নেতৃত্বে গোঁড়া যাজক ও খ্রীস্টানরা আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল লাইব্রেরি ধ্বংস করে, এবং অঙ্কবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ মহিলা হাইপাটিয়াকে হত্যা করে। ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে ভ্যান্ডালদের নেতৃত্বে আরো ব্যাপকভাবে এ ধরনের ধ্বংসলীলা চালানো হয় ধর্মের নামে (এ থেকেই এসেছে vandal sm কথাটি।)

এই কালপর্বে রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হতে থাকে, এবং খ্রীস্টধর্ম ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়াতে থাকে। দশম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইয়োরোপই বাস্তবত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। তবে সপ্তম শতাব্দীর পর ক্রমপ্রসার্যমাণ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয় এবং আফ্রিকা ও এশিয়ায় খ্রীস্টধর্মের প্রসার বাধা পায়। খ্রীস্টধর্ম অবশ্য ইসলাম থেকে গুণগতভাবে কিছু পৃথক ছিল। যে সব অঞ্চলে এ ধর্ম ছড়িয়েছে, সেখানকার

প্রচলিত ধর্মচিন্তাকে খ্রীস্টধর্ম পুরোপুরি ধ্বংস করে নি, বরং সেগুলির অনেকখানি গ্রহণ করে।

ধর্ম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন্মায়, পাল্টায়। খ্রীস্টধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী সময়কালে রোম সাম্রাজ্য ক্ষমতাগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভাজিত হতে থাকে। পশ্চিমে সম্রাটের ক্ষমতা কমতে কমতে লুপ্ত হয়ে গেলে, চার্চের প্রধান অর্থাৎ রোমের বিশপ (যাকে পোপ নামে ডাকা হতো) চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ব অংশে তা হয় নি এবং শাসকসম্রাট চার্চের স্বাধীন ক্ষমতা খর্ব করে। এভাবে ক্ষমতাগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের চার্চের বিভাজন ঘটে, এরই সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের নিয়ম কানুন, আচারবিধি ইত্যাদিরও। ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিভাজন পূর্ণতা লাভ করে—পশ্চিমগোষ্ঠীর নাম হয় রোমান ক্যাথলিক, পূর্বের গ্রেকো-অর্থোডক্স। ক্যাথলিকদের মতে ঐশ্বরিক আত্মা' 'পিতা' ও 'সন্তান' (ঈশ্বর ও যীশু) উভয়ের থেকেই আসে. অর্থোডক্সদের মতে শুধু 'পিতা' থেকে। এ ধরনের আরো কিছু তফাৎ এদের মধ্যে রয়েছে—যেমন ক্যাথলিকরা জল ছিটিয়ে ধর্ম গ্রহণ করে (christening), অর্থোডক্সরা তখন জলে পুরো শরীর ডোবায়। ক্যাথলিকদের কোনো ধর্মযাজকই বিয়ে করতে পারবে না, কিন্তু অর্থোডক্সদের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী (monks and nuns) ছাড়া বাকিদের কাছে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, ইত্যাদি। ক্যাথলিক চার্চ সাংগঠনিকভাবে অনেক শক্তিশালী এবং বহু দেশের রাজনৈতিক তথা শাসন ক্ষমতার নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যাথলিক চার্চের এই শাসকচরিত্র প্রকট হয় মধ্যযুগে, যখন ইয়োরোপে ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মীয় নানা গোষ্ঠী. মতবাদ ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ 'হোলি ইনকুইজিশান' নামে বিশেষ ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করে। যাদেরই ক্যাথলিক-বিরোধী মনে করা হতো, তাদেরই 'বিচার' করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো, অকথ্য অত্যাচার থেকে শুরু করে পুড়িয়ে মারা—সবই ধর্মের নামে চলতে থাকল। এই গোঁড়ামি আর যুক্তিহীন জান্তব অন্ধতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবশ্যম্ভাবীরূপে নানা কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়—যার অন্যতম হলো ডাইনী ও মন্ত্রজ্ঞ ওঝাদের সম্পর্কে ধারণা। ধর্মের নামে স্পেন সহ নানা অঞ্চলে হাজার হাজার নির্দোষ মানুষকে, মানবপ্রেমিক হিসেবে প্রচারিত যীশুকে সামনে রেখে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো।

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা

মাঝামাঝি সময়কালে পৃথিবীর শতকরা ৩৩'৩ ভাগ মানুষ ছিলেন তথাকথিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এঁদের মধ্যে ১৮'৮ ভাগ রোমান ক্যাথলিক, ৬'৯ ভাগ প্রোটেস্টান্ট, ৩'২ ভাগ অর্থোডক্স, ১'৪ ভাগ অ্যাংলিকান ও ৩'০ ভাগ অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত। এঁরা সবাই মিলে ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর ২৫১টি দেশে। এখানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে এদের শতকরা ভাগ কত তা দেওয়া হলো ঃ

আয়ারল্যান্ড—৯৩'১ (রোমান ক্যাথলিক), ২'৮ (অ্যাংলিকান), ০'৪ (প্রেসবিটেরিয়ান) (এ দেশের সরকারি ধর্ম আগে ছিল রোমান ক্যাথলিক)

আইসল্যান্ড—৯৬'৭ (লুথেরান), ০'৭ (রোমান ক্যাথলিক) (সরকারি ধর্ম ইভানজেলিক্যাল লুথেরান)

ইংল্যান্ড—৫৬'৮ (অ্যাংলিকান), ১৩'১ (রোমান ক্যাথলিক), ১৩'১ (প্রেসবিটেরিয়ান), ৪'৩ (মেথডিস্ট), ১'৪ (ব্যাপটিস্ট) (সরকারি ধর্ম না থাকলেও নিজ নিজ এলাকায় ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড-এর চার্চ সরকারিভাবে সুরক্ষিত)

আমেরিকা—৫৫'১ (প্রোটেস্টান্ট), ২৯'৭ (রোমান ক্যাথলিক), ২'৩ (অর্থোডক্স) (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)

লেসোথো—৪৩'৫ (রোমান ক্যাথলিক), ২৯'৮ (প্রোটেস্টান্ট, মূলত এভানজেলিক্যাল), ১১'৫ (অ্যাংলিকান), ৮'০ (অন্যান্য খ্রীস্টান) (সরকারি ধর্ম খ্রীস্টধর্ম)

অ্যান্ডোরা ৯৪'২ (রোমান ক্যাথলিক), ০'২ (প্রোটেস্টান্ট) (সরকারি ধর্ম রোমান ক্যাথলিক)

আর্জেন্টিনা—৯২'৮ (রোমান ক্যাথলিক) (সরকারি ধর্ম—ঐ)

বলিভিয়া—৯৪ (ঐ) (সরকারি ধর্ম—ঐ)

কোস্টারিকা—৯২'৪ (রোমান ক্যাথলিক), বাকিরা মূলত প্রোটেস্টান্ট (সরকারি ধর্ম—ঐ)

সাইপ্রাস—প্রায় সবাই গ্রীক অর্থোডক্স

ডেনমার্ক—৯০'৬ (ইভানজেলিক্যাল লুথেরান,), ০'৫ (রোমান ক্যাথলিক), (সরকারি ধর্ম—ইভানজেলিক্যাল লুথেরান)

ফির্রি দ্বীপ (Faeroe Islands) (জনসংখ্যা—৪৬৯৮৬)—৭৪'৪ (ডেনমার্কের ইভানজেলিক্যাল লুথেরান চার্চ), ১৯'৮ (প্লাইমাউথ ব্রিদেন), ০'১ (রোমান ক্যাথলিক) (সরকারি ধর্ম—ঐ)

গ্রীস—৯৭ ৬ (গ্রীক অর্থোডক্স), ০'৪ (রোমান ক্যাথলিক), ০'১ (প্রোটেস্টান্ট) (সরকারি ধর্ম—ইস্টার্ন অর্থোডক্স)

গ্রীনল্যান্ড—৯৭'৮ (প্রোটেস্টান্ট) (সরকারি ধর্ম—ইভানজেলিক্যাল লুথেরান)

ম্যাকাউ—৭ ৪ (রোমান ক্যাথলিক), ১'৩ (প্রোটেস্টান্ট) (সরকারি ধর্ম—রোমান ক্যাথলিক ; অথচ এ দেশের ৪৫ ১ ভাগ লোক বৌদ্ধ ও ৪৫'৮ ভাগ লোক ধর্মহীন বা অধার্মিক)

মাল্টা—৯৭'৩ (রোমান ক্যাথলিক), ১·২ (অ্যাংলিকান) (সরকারি ধর্ম—রোমান ক্যাথলিক)

নরওয়ে—৮৭'৯ (লুথেরান) (সরকারি ধর্ম—ইভানজেলিক্যাল লুথেরান)

প্যারাগুয়ে—৯৬ (রোমান ক্যাথলিক), ২'১ (প্রোটেস্টান্ট) (সরকারি ধর্ম রোমান ক্যাথলিক)

পেরু—৯২'৪ (রোমান ক্যাথলিক) (সরকারি ধর্ম—ঐ)

সাও টোমে ও প্রিন্সিপে (জনসংখ্যা ১,১৭,০০০)—৮০ (রোমান ক্যাথলিক), অবশিষ্ট, প্রোটেস্টান্ট (— সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট ও নিজস্ব ইভানজেলিক্যাল চার্চ) (সরকারি ধর্ম—ঐ)

সুইডেন—৮৯ ৬ (চার্চ অব সুইডেন—তবে এঁদের ৩০ ভাগই ধর্মাচরণ করেন না), ১ ৪ (রোমান ক্যাথলিক), ১ ২ (পেন্টিকোস্টাল) (সরকারি ধর্ম—লুথেরান)

ভারত – ২'৪৩ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)

চীন—০ ২ (ঐ)

রাশিয়া—৩১ ৫ (অর্থোডক্স), ৩'১ (প্রোটেস্টান্ট), ১'৮ (রোমান ক্যাথলিক) (ঐ)

কানাডা—৪৬'৫ (রোমান ক্যাথলিক), ৪১'২ (প্রোটেস্টান্ট), ১'৫ (ইস্টার্ন অর্থোডক্স) (ঐ)

ইটালি—৮৩ ২ (রোমান ক্যাথলিক) (ঐ)

ফ্রান্স—৭৬ ৪ (রোমান ক্যাথলিক), ৩'৭ (অন্যান্য গোষ্ঠীর খ্রীস্টান) (ঐ)

হাঙ্গেরি—৫৩ ৯ (রোমান ক্যাথলিক), ২১'৬ (প্রোটেস্টান্ট (ঐ)

ইন্দোনেশিয়া—৯'৬ (সরকারি ধর্ম – ইসলাম)

ইরাক—৩ ৫ (ঐ)

পাকিস্তান—১'৬ (ঐ) ইত্যাদি

পাশাপাশি এই সময়ে কিছু ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগিতাও অনুভূত হয়। তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিকে যুক্তি গ্রাহ্য ও 'বিজ্ঞানসম্মত' করার প্রচেষ্টায় 'স্কলাস্টিক' মতবাদের জন্ম দেন। কিন্তু আরো কিছু গোঁড়া ধার্মিকদের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্ম ছিল তেল আর জলের মতো, তাদের কাছে বিজ্ঞানের চর্চা যারা করে তারা খ্রীস্টধর্মের বিরোধী অর্থাৎ হত্যার যোগ্য।` ইয়োরোপের মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চও এই মানসিকতায় সম্পূর্ণ-ভাবে ডুবে যায়। কোপার্নিকাস-এর বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়। রজার বেকন, গালিলিও গ্যালিলেই প্রমুখ দার্শনিক বিজ্ঞানীদের ওপর অত্যাচার নেমে আসে, জিওরদানো ব্রুনো ও লুচিলিও ভানিনির মতো বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু অব্দি চলতে থাকে এই বাধাহীন ধর্মীয় তান্ডব।

কিন্তু এরপরের সময়কালেই ইয়োরোপে অঙ্কুরিত হলো সামন্ততান্ত্রিক, তথা ক্যাথলিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে উদার ও তৎকালে প্রগতিশীল বুর্জোয়া মতবাদ। পোপের কর্তৃত্ব আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মতাদর্শ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুরু হয় রিফর্মেশান আন্দোলন তথা বিভিন্ন প্রতিবাদী প্রোটেস্টান্ট চার্চ-এর সৃষ্টি প্রক্রিয়া। ধর্মীয় ব্যাপারগুলি অবশ্য থাকলই। তবে গুণগতভাবে না হলেও তাদের বাহ্যিক কিছু পরিমার্জন ও সংশোধন করা হলো। জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় এভাবে গড়ে উঠল লুথেরান চার্চ। সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস-এ ক্যালভিনিজম, স্কটল্যান্ডে প্রেসবিটেরিয়া-নিজম, ইংল্যান্ডে অ্যাংলিকান চার্চ ইত্যাদি। এই সব প্রোটেস্টান্ট চার্চ প্রচলিত ধর্মীয় পুস্তককে ধর্মাচরণের একমাত্র নির্দেশিকা হিসেবে মানতে অস্বীকার করে। ক্যাথলিক চার্চের মত ছিল 'ভাল কাজ' করা বা চার্চকে দান করাটাই মুখ্য কাজ—প্রোটেস্টান্টরা ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রধান গুরুত্ব দেন। এঁরা চার্চের ওপর নয়, মানুষেরই ওপর ধর্মাচরণের কর্তৃত্ব আরোপ করার কথা বলেন। এরই সঙ্গে পোপের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কোথাও বুর্জোয়ারা শাসন ক্ষমতা দখল করে।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ জার্মানির একটি ছোট ক্যাথলিক গোষ্ঠী পোপের মাহাত্ম্যে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং কিছু গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ও সরলীকরণ ঘটান। ১৯২০ সালে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু ক্যাথলিক যাজক আলাদা চেক ক্যাথলিক চার্চ

গঠন করেন। এ-ধরনের ছোটখাট কিছু ঘটনা ছাড়া ক্যাথলিক মতের বিশেষ ভাঙন ঘটে নি। এর একটি কারণ, ব্যাপক মানুষের কাছে, অলীক হলেও একটি কার্যকর আশ্রয় হিসেবে ক্যাথলিক মতের উপযোগিতা। এখনো অব্দি গরিষ্ঠ সংখ্যার মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিকুল শক্তিসমূহের কাছে অসহায়। এই অসহায়ত্বের ওপর প্রলেপ দিয়ে, আপাত মানসিক সাহস ও শান্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রতিবাদী ও ঐতিহ্যের মায়া মাখানো ক্যাথলিক মত (অন্যান্য ধর্মও) তার ভূমিকা পালন করতে পারছে।

এরই পাশাপাশি শিল্পবিপ্লব ও বুর্জোয়া বিকাশের ফলে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিশ্বে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা নিয়েছে বিগত শতাব্দী থেকে। এর ফলে তারা সারা বিশ্বে যেমন অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে, তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের ধর্মমতকে এই আধিপত্যের উপযোগী করে ব্যবহার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এশিয়া, আফ্রিকা সহ পৃথিবীর নানা উপনিবেশে খ্রীস্টধর্মের যাজক তথা প্রচারকরাও ছড়িয়ে পড়েছে। তারা একদিকে ঐ সব দেশের মানুষদের একাংশকে যীশুর ভালবাসার বাণী শুনিয়ে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, অন্যদিকে তাদের দুর্দশার মূলে তাদের পাপই দায়ী আর এ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যীশুর আশ্রয় নেওয়ার কথা বলে স্বধর্মীয় নয়া শাসকদের তথা সমগ্র শাসক-কুলকে আড়াল করতে সমর্থ হয়েছে। কলকাতার বস্তি থেকে আফ্রিকার অরণ্য—সর্বত্র এদের বিচরণ।

বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে তথাকথিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের একাংশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় রয়েছে। এর একটি প্রতিফলন দেখা যায়, বর্তমানে সব ধর্মের মধ্যে অনুগামীর সংখ্যা বিচারে এদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যেও। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যেও অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন রয়েছে, তেমনি ধর্মমতের খুঁটিনাটি নানা ক্ষেত্রেও অনৈক্য রয়েছে। আগামী কয়েক দশক বা শতাব্দী পরে, সমাজ ও অর্থ-নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, অন্যান্য ধর্মের মতো খ্রীস্টধর্মও তার অনুগামীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারে—প্রাচীন নানা ধর্মের মত বিলুপ্তও হয়ে যাবে একদিন এবং এটি বর্তমানে কমবেশি প্রচলিত অন্যান্য সব ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি।

বৌদ্ধ ধর্ম

বিশেষ সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজনে মানুষ কিভাবে বিশেষ আদর্শ ও মূল্যবোধ বা তথাকথিত ধর্মমতের জন্ম দেয় এবং কিভাবে এই প্রয়োজন কমে কমে গেলে বা ফুরিয়ে গেলে, ঐ ধর্মমতের ধীর অবলুপ্তি ঘটতে থাকে. তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বৌদ্ধধর্ম।

বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র শতকরা ছ-ভাগ মানুষ তথাকথিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী, এমনকি কয়েক দশক আগেও এই সংখ্যা ছিল বিপুল। প্রাচীনত্বের বিচারে বৌদ্ধধর্ম ইসলাম, খ্রীস্ট, এমনকি হিন্দুধর্মেরও পূর্বসূরী, কিন্তু বৈদিকধর্মের পরবর্তীকালের।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিকধর্ম ও তার ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদী হিসেবেই এই মানবিক ও তুলনামূলকভাবে অন্ধ সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি ঘটে। এবং এই ভারতীয় ভূখণ্ডেই তার সৃষ্টি ও বিকাশ—অন্যান্য দেশে ভারতের বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মমতও সেখানে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরুতেই ভারতীয় ভূখণ্ডের বিশেষত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং পূর্বদিকে শাসকগোষ্ঠীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্যদিকেও প্রসারিত হতে থাকে। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়কালে এই বৈদিকধর্ম এবং তার পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যধর্মের জনবিরোধী চরিত্রের জন্যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি শুরু হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর, অনুষ্ঠানাদি ও আগ্রাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ছোটো-বড়ো ধর্মীয় আন্দোলন (ঐ পরিবেশে যা সামাজিক আন্দোলনেরই নামান্তর) শুরু হতে থাকে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে নতুনতর সূক্ষ্ম কৌশল সৃষ্টি করেন—সাহিত্য তথা তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যার নাম হয় উপনিষদ। নতুন ধরনের মোক্ষলাভ ও তুরীয় জ্ঞানের কথা বলা হয়, বেদকে অস্বীকার না করেই।

কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহিরাগত আর্য-শাসকগোষ্ঠীর তথা বেদের প্রভাব এত গভীর ছিল না। ফলে ঐ সব অঞ্চলে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মতবাদ, বিতর্ক ও প্রতিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ক্রমে গোষ্ঠীগত ঐক্য ভাঙতে থাকে। ছোটো ছোটো শাসকগোষ্ঠী, ছোটো ছোটো রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা, পরীক্ষামূলক কাজকর্ম, সন্দেহ করা ও বিতর্ক করা ইত্যাদি শুরু হয়।

এইভাবেই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েই নানা নতুনতর চিন্তার তথা ধর্মমতের সৃষ্টি হয়। সঞ্জয় বেলাথিপুত্তের নেতৃত্বে সন্দেহবাদ বা নাস্তিক্যবাদ, পকুধ কাত্যায়নের নেতৃত্বে কণাবাদ (atomism), অজিত কেসকম্বলিনের নেতৃত্বে বস্তুবাদ, পূরণ কাসপ-এর নেতৃত্বে আইনী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মতবাদ ইত্যাদি গড়ে ওঠে। শঙ্করাচার্য, কপিল, বৃহস্পতি, চার্বাক প্রমুখরাও বেদের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। বহু মানুষই এ ধরনের পরিব্রাজক, বৈপ্লবিক মতাবলম্বী সন্ন্যাসী তথা চিন্তাবিদের শিষ্যত্ব নিতেন, এবং ঐ অনুযায়ী নিজেদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, অর্থনীতি আর সাংস্কৃতিক চেতনাকে গড়ে তুলতেন। (পাশাপাশি অজিবিকাশের প্রচার করা নিয়তিবাদও সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় জৈনধর্মও।)

এমনই এক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরীক্ষাদির সময়কালে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়—খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৩ সালের মে মাসে (বৈশাখী পূর্ণিমার দিন)—বর্তমানে নেপালে অবস্থিত রুম্মিন্দেই-এ (প্রাচীন নাম লুম্বিনী উদ্যান)। কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ছেলে তিনি। জন্মের পঞ্চম দিনে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর নামকরণ করেন সিদ্ধার্থ (পালি ভাষায়—সিদ্দাত্ত)—যার অর্থ 'যার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে'। জন্মের সপ্তম দিনেই তার মা মারা যান এবং সিদ্ধার্থকে লালন পালন করেন শুদ্ধোদনের শ্যালিকা তথা দ্বিতীয়া স্ত্রী মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর জীবন ও উপদেশাবলী লিখিত হয়। তার আগে শ্রুতি হিসেবেই এগুলি চালু ছিল (এবম ময়া শ্রুতম)। বৌদ্ধধর্মের স্বীকৃত ও প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ হলো—তিপিটক। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পালি ভাষায় লেখা। এর তিনটি অংশ বিনয়পিটক (নিয়মকানুন), সুত্তপিটক (উপদেশাবলী) ও অভিধর্মপিটক (আধিভৌতিক আলোচনা)। মূলত এটি শ্রীলংকায় রক্ষিত আছে। পরবর্তীকালে অন্যত্র, অন্যান্য ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা, সংযোজন ও বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। বলা হয়েছে বুদ্ধের জন্মের পর ঐ ১০৮ জন ব্রাহ্মণের অনেকেই নাকি বলেছিলেন,

এই শিশু সংসার ত্যাগ করবে, এদের মধ্যে কোন্দন্ন নামের এক ব্রাহ্মণও ছিলেন। এগুলি সত্যি কি মিথ্যে তা যাচাই করার উপায় নেই, নিছক যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি প্রয়োগ করা ছাড়া।

তবে এটি অবিতর্কিত যে, সিদ্ধার্থকে চূড়ান্ত বিলাসিতা আর আরামের মধ্যে মানুষ করা হয়, যাতে তিনি গৃহত্যাগ করার চিন্তা কোনোদিন মাথায় না আনেন। ১৬ বছব বয়সে, সমবযসী এবং আত্মীয়তাসূত্রে বোন, রাজকুমারী যশোধবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বয়েস যখন ২৯ তখন নাকি তিনি রথে করে রাস্তায় বেরিয়ে বৃদ্ধ, অসুস্থ, মৃতদেহ ও সাধু—এই চারটির দৃশ্য দেখেন। যদিও বলা হয়, এমন জিনিস তিনি ঐ প্রথম দেখলেন, তবে যথাসম্ভব ব্যাপারটি প্রতীকী। না হলে ২৯ বছর বয়স অব্দি এদের তিনি কখনো দেখেন নি এমনটি অস্বাভাবিক। যাই হোক এ থেকেই তিনি সংসার, এই মনুষ্যদেহ, এই আত্মীয়স্বজন—এদের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন। যেদিন সাধু দেখেন সেদিনই রাস্তা থেকে ফিরে তিনি তাঁর পুত্র রাহুলের জন্ম সংবাদ পান। এবং সিদ্ধান্ত নেন সংসার ত্যাগ করবেন।

সাধুর বেশে তিনি দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মগধের রাজধানী রাজগৃহ (বর্তমান নাম রাজগির) আসেন এবং এখানকার রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে দেখা হয়। গৌতম বলেন, তিনি সত্য জানার জন্য বেরিয়েছেন। গুরুর সন্ধান করেন। তিনি উরুবেলা-র কাছে সেনানিগম গ্রামে আসেন। এখানে কোন্দন্ন (বা কৌণ্ডিন্য) সহ পাঁচজন তাঁর শিষ্য হন। ছ-বছর ধরে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে গৌতম প্রকৃত জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর শরীর কঙ্কালসার হয়ে যায়। (২-৪র্থ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে তৈরি একটি গান্ধারমূর্তিতে গৌতমের এই শারীরিক অবস্থার ছবি পাওয়া যায়।) তিনি জ্ঞান হারাতে থাকেন এবং বোঝেন এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না। শিষ্যদের একথা বলতে তাঁরা গৌতমের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে চলে যান!

এক সকালে গৌতম একটা বটগাছের নিচে বসে আছেন। সেনানিগম গ্রামের জমিদারের মেয়ে সুজাতা এসে তাকে একবাটি পায়েস খাইয়ে যান। গৌতম শরীর ও মনের জোর পান। সারাদিন শালজঙ্গলে ঘুরে, সন্ধ্যেবেলা একটা অশ্বত্থ গাছতলায় বসে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সত্যজ্ঞান লাভ না করে তিনি উঠবেন না। এই সময় 'মার' (মারি ?) নামে শয়তান নাকি তাঁকে

প্রলুব্ধ করতে থাকে। গৌতম তাঁর অসংখ্য 'পূর্বজন্মে' বোধিসত্ত্ব হিসেবে (বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের জন্মগুলির নাম) যে ১০টি গুণ বা পারমিতা অর্জন করেছিলেন, তার সাহায্যে তিনি 'মার'-কে প্রতিহত করেন। এই ১০টি গুণ হলো—দয়া, নৈতিকতা, আত্মোৎসর্গ, প্রজ্ঞা, প্রচেষ্টা, ধৈর্য, প্রকৃতজ্ঞান, দৃঢ়সংকল্প, বিশ্বজনীন-প্রেম ও মানসিক সমতা। তিনি বলেন, মার-এর অস্ত্র তো ১০টি—কাম-লালসা, উচ্চতর জীবনের জন্য অনাকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, জড়ত্ব ও আলস্য, ভীরুতা, সন্দেহ, ভণ্ডামি, মিথ্যা অহংকার এবং পরনিন্দা ও আত্মগরিমা। সুত্তনিপাত-এর পধানসুত্ত অংশে মার-এর সঙ্গে গৌতমের এই যুদ্ধের কথা বলা আছে। কিন্তু স্পষ্টত এটি কোনো বাস্তব যুদ্ধ নয়—এটি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রামের কল্পিত প্রতীকী চিত্র এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা।

বলা হয় তিনি সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে পূর্বজন্ম সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন করেন, রাত ১০টা থেকে ২টোর মধ্যে লাভ করেন অতিমানবিক ঐশ্বরিক দৃষ্টি এবং ভোর ৬টার মধ্যে তিনি চরম সত্যজ্ঞান অর্জন করেন, এবং মনের ক্ষত ও মালিন্য দূর করেন। সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা. ৫২৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মে মাস। তখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর।

এরপর ৫-৭ সপ্তাহ ধরে তিনি উরুবেলাতেই তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে চিন্তাভাবনা (ধ্যান) করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, কোনো কিছুই চিরন্তন বা চিরস্থায়ী নয়, আত্মার মতো কোনো স্থায়ী বা চরম কিছু নেই, কোনো কিছুই অপরিবর্তনশীল বা ধ্রুব নয়। তিনি বোঝেন সব কিছুই পরস্পর নির্ভরশীল ও আপেক্ষিক।

এই সব জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করে গৌতম হন বুদ্ধ। এরপর তিনি শিষ্যের খোঁজে বেরোন। বারানসীতে পূর্বের ঐ পাঁচ জন শিষ্যকে পান। তিনি তাদের নতুন উপলব্ধির খবর দিলেন। বারানসীর কাছে সারনাথে তিনি এই পাঁচজনকে তার প্রথম ধর্মোপদেশ দেন (পালিতে যার নাম—ধম্মচক্কপবত্তন; setting in motion the wheel of truth)। (পরে একটি স্তূপ করে এ জায়গাটি এখনো চিহ্নিত আছে।) তিনি বলেন, যে-ব্যক্তি গৃহত্যাগ করে এগিয়ে যেতে চান (পবর্জিত) তার মধ্যপন্থা অনুসরণ করা উচিত (মজঝিমা পটিপদা)—চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন বা চূড়ান্ত অসংযম, এই দুই চরম দিকের কোনটিই সঠিক পথ নয়। তিনি আটটি পথের কথা

বলেন—সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক চিন্তা, সঠিক কথা, সঠিক কাজ, সঠিক জীবনধারণ, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক একাগ্রতা ও সঠিক স্মৃতি।

যে পাঁচজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের ভিক্ষু নাম দেওয়া হয় এবং সংগঠন গড়া হয় 'সঙ্ঘ' নাম দিয়ে—এঁরা তার প্রথম সদস্য। বুদ্ধ তিন মাস বারানসীতে থাকেন। যশ নামে স্থানীয় ধনী ব্যক্তি ও তার বাবা-মা-স্ত্রীও বুদ্ধের শিষ্যত্ব নেন। এরপর যস-এর চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরে এঁদের পঞ্চাশ জন বন্ধু, এইভাবে মোট ষাট জন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁরা প্রুটি মুক্ত, অরহন্ত। এঁরা তিন ঐশ্বর্যের অবলম্বী—বুদ্ধ, ধম্ম (অর্থাৎ শৃঙ্খলা ও নিয়মাদি) ও সঙ্ঘ। তাঁর নির্দেশে এঁরা ভারতের বিভিন্নদিকে বুদ্ধের কথাবার্তা প্রচার করতে ছড়িয়ে পড়েন। বুদ্ধ যান উরুবেলায়। তিনি মাথায় জটাওয়ালা জটিল নামে পরিচিত তিন সন্ন্যাসী ও তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষা দেন এবং 'অগ্নি উপদেশ' (পালিতে—আদিত্ত পরিযাজ সুত্ত) দেন। বলেন, যৌনলালসা, অন্যের প্রতি ঘৃণা এবং মিথ্যা ধারণা (delusion)—এই তিন আগুনে মানুষের অস্তিত্ব পুড়ে ছারখার হচ্ছে।

উরুবেলা থেকে বুদ্ধ যান বিম্বিসারের কাছে। তিনি ও তাঁর বহু প্রজা বুদ্ধের শিষ্য হন। সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান নামে দুই ব্রাহ্মণ সাধুও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখান থেকে যান নিজ রাজ্যে কপিলবস্তুতে। বাবা, মা, কাকা, ও অন্যান্যরা তাঁর শিষ্য হন। এখানে বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলেন, এমন একটা নিয়ম যেন করা হয় যাতে কোনো ছেলে তার বাবা-মা-র অনুমতি ছাড়া দীক্ষিত হবে না। বুদ্ধ এই অনুরোধ রাখেন এবং এখনো এই নিয়ম চালু আছে।

এই সময় তাঁর জ্ঞাতি ভাই ও শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। গোতমী ও তাঁর বান্ধবীরা হলেন এর প্রথম সদস্যা। তখনকার ঐ পরিবেশে, নারীদের এই ভাবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া একটি 'বিপ্লবিক ব্যাপার ছিল—অবশ্য সামাজিক প্রভাবে বুদ্ধ-ও শুরুতে এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'ভবঘুরে শাস্ত্র'-এ মন্তব্য করেছেন, "যে সব পুরুষ নারীর প্রতি অধিক উদারতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমি বুদ্ধকেও একজন মনে করি। তিনি যে অনেক ব্যাপারে সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন নারীর ভিক্ষুণী হবার প্রশ্ন উঠল তখন প্রথমে তিনি বড় গড়িমসি করলেন, পরে

অবশ্য নিরুপায় হয়ে নারীদের সঙ্ঘে আসার অধিকার দিলেন। তাঁর অন্তিম সময়ে, নির্বাচনের দিনে, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, নারীর প্রতি ভিক্ষুর ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তখন তিনি বললেন, 'অদর্শন' অর্থাৎ না দেখা।"...ইত্যাদি)

দেবদত্ত নামে আরেক আত্মীয় তাঁর শিষ্য হলেও, কয়েক বছর পরেই তিনি ক্ষমতালিপ্সু হয়ে ওঠেন। বুদ্ধকে বলেন, সংঘের নেতৃপদে তার নাম মনোনীত করতে। কিন্তু সঙ্ঘের প্রধান নির্বাচিত হতেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—অধিকাংশের ভোটে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল পদ্ধতির প্রায় সবকটিই তিনি ঐ সময়েই প্রয়োগ করেন। বুদ্ধ কঠোরভাবে এসব নিয়ম মানতেন এবং দেবদত্তকে নিরাশ করেন। এই দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেন তিন তিনবার, কিন্তু ব্যর্থ হন।

৮০ বছর বয়সে বুদ্ধ রাজগৃহ ছেড়ে উত্তরে যান। পথে অসংখ্য মানুষ তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে থাকে। লিচ্ছবির রাজধানী বেসালী-তে রাজনর্তকী অম্বপালী তাঁকে উদ্যান দান করেন। তবে বুদ্ধ ওখানে না থেকে পাশের গ্রাম বেলুবাগামক-এ থাকেন। এখানে অসুস্থ হলেও ঐ অবস্থায় বেশালী ছেড়ে আরো উত্তরে পাবা-য় আসেন এবং স্বর্ণকার শিষ্য চুন্দ-র উদ্যানে থাকেন। এখানে বুদ্ধ আরো অসুস্থ হন। ওইভাবেই তিনি কুসীনারায় আসেন। এবং বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, ৪৮৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের মে মাসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বুদ্ধ তাঁর নিজের যে উপলব্ধির কথা বলেন স্পষ্টত তা ঐ সময়কার পরিবেশে ছিল বৈপ্লবিক, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী। তিনি তাঁর এই উপলব্ধি থেকে যে-সব সিদ্ধান্ত প্রচার করেন তার মূল্যবান একটি হলো—জাতিভেদ প্রথা তথা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ প্রথার বিরোধিতা। (কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজনের বিরোধিতা নয়।) তিনি সব মানুষকে সমান হিসেবে গণ্য করে ভালোবাসার কথা বলেন। প্রচলিত বৈদিক আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মানবিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেন। পূর্বজন্ম, ভাগ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ঈশ্বর যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ঐভাবে নয়—তিনি বলেন অপরাধ ও অনৈতিক কাজকর্ম দারিদ্র্য থেকেই সৃষ্টি

হয়। তাই শাস্তি দিয়ে এসব সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাধান দারিদ্র্য দূর করা।

অস্তিত্বহীন দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে বেদে পশুবলির কথা বলা হয়েছে। এভাবে অসংখ্য গরু-মহিষাদি হত্যাও হয়েছে। কিন্তু চাষের ও খাদ্যের প্রয়োজনে গোসংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই সামাজিক প্রয়োজনের ছাপও বুদ্ধের নির্দেশাবলীতে পাওয়া যায়—কঠোরভাবে পশুহত্যা বন্ধ করার মধ্য দিয়ে।

বুদ্ধ অলৌকিকত্বের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর শিষ্যরা কখনো এভাবে 'অলৌকিক ভেল্কি' দেখিয়ে লোক ভোলালে বুদ্ধ কঠোরভাবে তা বন্ধ করেছেন। তাই বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে নানা আপাত-অলৌকিক কাহিনীগুলো যে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত এটি মোটা-মুটি নিশ্চিত। তিনি উপনিষদের ও আত্মার আধিভৌতিক অস্তিত্বের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে বাস্তব কাজ আর নৈতিক জ্ঞান—এর দ্বারাই নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—আত্মার সাহায্যে নয়।

তখনকার বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবিলতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম এক বৈপ্লবিক ও উদার মানবতাবাদী আদর্শ আর মূল্যবোধ নিয়ে আপামর জনসাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইতে, অনেক ক্ষত্রিয় রাজা বৌদ্ধধর্মকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। এর ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অস্বীকার করে তাঁরা নিজেরা নিজেদের স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ব্রাহ্মণদের শারীরিক শ্রমহীন, সুবিধাভোগী জীবনের ওপর মনে মনে ঘৃণা পোষণকারী বহু তথা-কথিত নিম্নবর্ণের মানুষও বুদ্ধধর্মের মধ্যে নিজের সম্মান ও মর্যাদা খুঁজে পান। (পরবর্তীকালে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের ক্ষেত্রেও এ-ব্যাপার কিছুটা ঘটেছে।) বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা যত প্রসারিত করেছে, ততই বৌদ্ধধর্মেরও প্রসার ঘটিয়েছে। বহির্ভারতে ব্যবসা ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের সময় অন্যান্য দেশেও বৌদ্ধধর্ম ছড়ায় ও অচিরে জনপ্রিয় হয়। শ্রীলঙ্কা থেকে জাপান, থাইল্যান্ড থেকে চীন—বিশাল এলাকার মানুষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়।

১ম-২য় শতাব্দীর সময়কালে বহিরাগত (মধ্য-এশিয়ার) কুষাণ রাজারা ভারতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা এই বহিরাগতদের

কয়েকটি দেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শতকরা ভাগ

পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫·৭ ভাগ মানুষ ছিলেন তথাকথিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এঁরা ছড়িয়ে আছেন ৮৬টি দেশে। এখানে কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শতকরা হিসেব দেওয়া হলো ঃ

দেশ	জনসংখ্যার কত ভাগ
থাইল্যান্ড	৯৫ (সরকারি ধর্ম—বৌদ্ধ)
বর্মা	৮৯·৪ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
কাম্পুচিয়া	৮৮·৪ (ঐ)
জাপান	৭৩·৯ (ঐ) [এঁদের অনেকে একইসঙ্গে শিন্টো ধর্মেও বিশ্বাস করেন]
ভুটান	৬৯·৬ (সরকারি ধর্ম—মহাযান বৌদ্ধ)
শ্রীলঙ্কা	৬৯·৩ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
লাওস	৫৭·৮ (ঐ)
ভিয়েতনাম	৫৫·৩ (ঐ)
ম্যাকাও	৪৫·১ (সরকারি ধর্ম—রোমান ক্যাথলিক)
তাইওয়ান	৪৩ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
সিঙ্গাপুর	২৬·৭ (ঐ)
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯·৯ ঐ)
মালয়েশিয়া	১৭·৩ (সরকারি ধর্ম—ইসলাম)
ব্রুনেই	১৪ (ঐ)
চীন	৬ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
নেপাল	৫·৩ (ঐ) *
উত্তর কোরিয়া	১·৭ (ঐ)
ইন্দোনেশিয়া	১ (সরকারি ধর্ম—একেশ্বরবাদ)
ভারত	০·৭১ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
মরিশাস	০·৪ (ঐ)
ব্রাজিল	০·৩ (ঐ)
অস্ট্রেলিয়া	০·২ (ঐ)
বাংলাদেশ	০·৬ (সরকারি ধর্ম—ইসলাম)
হংকং	অধিকাংশই বৌদ্ধ (ধর্মনিরপেক্ষ দেশ)
মঙ্গোলিয়া	সঠিক পরিসংখ্যান নেই। [আগে সবচেয়ে বেশি মানুষ ছিলেন বৌদ্ধ (লামাপন্থী)। বর্তমানে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকলেও, বহু মানুষ প্রচলিত ধর্মানুসরণ বন্ধ করেছেন।] (ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ)

ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। ফলে কুষাণরা নিজেদের সুরক্ষিত করতে বৌদ্ধ-ধর্মকে সর্বতোভাবে মদত দিতে থাকে। এইভাবে নানা ক্ষেত্রে নিছক বৌদ্ধ-ধর্মের উদার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, শাসকশ্রেণী নিজের স্বার্থেও বৌদ্ধ-ধর্মকে ব্যবহার করেছে (যা সব ধর্মমতের ক্ষেত্রেই কমবেশি সত্য)। এভাবে ব্যবহার করতে পারার একটি বড়ো কারণ বৌদ্ধধর্ম দারিদ্র্য দূর করার কথা বললেও কিভাবে তা হবে, সব মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসার কথা বললেও রাজা ও অভিজাত গোষ্ঠী তথা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বজায় রেখে তা বাস্তবত কতটা সম্ভব, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে নি এবং তখনকার সামাজিক পরিমণ্ডলে তা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটাতে থাকে। অন্যত্র, ও অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুপ্রবেশ করে। নানা বিভাজনও ঘটে। বুদ্ধের মৃত্যুর ৪-৫ শত বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৩০টি উপদলের সৃষ্টি হয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাজন ঘটে প্রথম খ্রীঃ শতাব্দী সময়কালে। হীনযান মতের প্রবক্তারা বুদ্ধের বলা আচারাদি কঠোরভাবে অনুসরণ করার কথা বলেন। অন্যদিকে দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণ সন্তান নাগার্জুন বুদ্ধের এই সব নির্দেশকে অনেক ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে পরিমার্জিত করেন। এবং মহাযান মতের জন্ম দেন।

ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে বোধহয় ছিল বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তারকে রোধ করতে না পেরে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাকে নিজেদের মতো করে গ্রহণীয় করে তোলার একটা প্রচেষ্টা। বুদ্ধ কোনো দেবতার কথা বলেন নি। কিন্তু স্থানীয় নানা গোষ্ঠীর মধ্যে দেব-দেবীর ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুদ্ধ তথা হীনযানীরা কোনো ব্যক্তির নির্বাণের জন্য নিজেরই কঠোর প্রচেষ্টার কথা বলতেন। কিন্তু মহাযানীরা বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে তা খুবই দুরূহ ও কষ্টকর। তাই এক মাধ্যম দরকার—ইনিই দেবতা। মহাযানীদের হাতে গৌতম বুদ্ধও দেবতার আসন পেলেন। তাদের মতে, গৌতম বুদ্ধের আগেও অনেক বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন—এদের মধ্যে বেদ-ব্রাহ্মণদের দেবতারা এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের স্থানীয় দেবতারাও আছে। এইভাবে মহাযানীরা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের অস্বীকার না করেই বৌদ্ধমতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরকম প্রায় হাজারখানেক বুদ্ধের কল্পনা করা হয়—এদের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা (এবং একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র),

আগামী পৃথিবীর বুদ্ধ হচ্ছেন মৈত্রেয়; বজ্রপাণি হচ্ছেন সর্বশেষ বুদ্ধ; মঞ্জুশ্রী সবচেয়ে জ্ঞানী; আদি বুদ্ধ হচ্ছেন এই পৃথিবীর স্রষ্টা; স্বর্গের অধিপতি হচ্ছেন অমিতাভ ইত্যাদি। এদের ছাড়া বোধিসত্ত্বদেরও পূজা করা হয় মহাযানমতে। মহাযানীরা আরেকটি জনপ্রিয় সংযোজন করেছিলেন, সেটি হলো—গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী না হয়েও নির্বাণ লাভ সম্ভব—এ-ধরনের ধারণার প্রচার। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তাদের এতদিনকার সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাবে, অনেক ক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করায় দ্বিধান্বিত হয়েছিল। মহাযানীরা সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ মানুষদের এ-ধরনের দ্বিধা কাটাতে স্বর্গ-নরকের রহস্যময় কিন্তু জনপ্রিয় কথাবার্তা বৌদ্ধধর্মে ঢোকান—যা বুদ্ধ কখনোই বলেন নি।

চীনে প্রথম শতাব্দীতেই হীনযান মত অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে এর বদলে মহাযান মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সপ্তম শতাব্দীতে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে তিব্বত অঞ্চলে মহাযান মত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং এখানে পদ্মসম্ভবের হাতে ধীরে ধীরে নানা রহস্যময় ক্রিয়াকাণ্ড তথা তন্ত্র বৌদ্ধধর্মে ঢুকতে থাকে। একাদশ শতাব্দীতে এই সংমিশ্রণের কাজ প্রায় পূর্ণতা লাভ করে। দরিদ্র ও চরম সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে থাকা তিব্বতীদের শাসন করার ক্ষেত্রে এই ধরনের বকচ্ছপ বৌদ্ধধর্ম তার শক্তিশালী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিধাহীন আনুগত্য আর সীমাহীন কুসংস্কারের জালে তাদের আটকে দলাই লামা হয়ে ওঠেন তিব্বতীদের শাসক—যিনি একসময় নিজের মলকে পর্যন্ত শুকিয়ে বড়ি করে রোগগ্রস্ত সরল বিশ্বাসী তিব্বতীদের দিতেন ওষুধ হিসেবে। এই দলাই লামাকে বলা হয় বোধিসত্ত্বের অবতার বা প্রতিভূ, কিন্তু জাগতিক কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত। প্রজাদের শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে দলাই লামার ভূমিকাই ছিল প্রধান। ধর্মের আবরণে ক্ষমতার প্রসার তিব্বত থেকে অন্যত্র ঘটতে থাকে, একইসঙ্গে লামা-তন্ত্রের প্রসারও।

বিভিন্ন দেশে, বিশেষত এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এখনও বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে রয়েছে তাদের অজস্র দল-উপদল। একদা প্রাচীন ভারত অন্যত্র তার ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করেছে (এবং কিছুটা হিন্দুধর্মকেও)। কিন্তু বর্তমান সময়কালে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের এই ভূমিকা নেই বললেই চলে। পাশাপাশি চীন-ভিয়েতনাম সহ এশিয়ার নানা দেশে, বহু মানুষ তথাকথিত

ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ওঠারও চেষ্টা করছেন। শাসক গোষ্ঠী তার আধিপত্যবাদকে সফল করতে ধর্মকেও নিজের মতো করে গড়ে তোলে, এবং ব্যবহার করে। বৌদ্ধধর্মও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবু এর প্রাথমিক মুক্ত চিন্তা আর তৎকালের প্রগতিশীল তত্ত্বগুলি সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। আজ আড়াই হাজার বছর পরে ধর্মপ্রসঙ্গে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ কি হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব এই ধর্মভাবনা খোরাক জোগাবে।

জৈন ধর্ম

হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও চার্বাক দর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন হিসেবে গণ্য করে—কারণ এরা কেউই বেদ-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে না, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে হিন্দুদের কল্পনাকেও পাত্তা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে গুরুগম্ভীর কথাবার্তার আড়ালে বৈদিকধর্মের আড়ম্বর-সর্বস্বতা ও ব্যাপক পশুবলি, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে ধর্মের অনুমোদন দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিকে (ব্রাহ্মণদের) অসীম ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি দেওয়া আর গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে হতমান করে রাখা তথা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য—এসবের প্রতিবাদী হিসেবে, সামাজিক প্রয়োজনে ও প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছাড়া ঐ একই সময়ে আরেকটি যে ধর্মমত গড়ে ওঠে সেটি হচ্ছে **জৈনধর্ম**।

তবে বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্ম আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি লাভ করে নি। মূলত ভারতবর্ষেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক প্রয়োজন কমে আসায় ভারত ভূখণ্ডেও এই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্ট কম। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ০·১ ভাগ মানুষ তথাকথিত জৈনধর্মাবলম্বী। এঁরা ভারতসহ পৃথিবীর মাত্র ১০টি দেশে ছড়িয়ে আছেন। ভারতীয়দের শতকরা ০·৪৮ ভাগ জৈন; অন্যান্য দেশেও এঁরা রয়েছেন আরো নগণ্য সংখ্যায়।

খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের সমসাময়িককালে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত বর্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন (৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে)। 'জিন' কথাটি সংস্কৃত এবং তার অর্থ বিজেতা। জৈনধর্মে ২৪ জন জিন-এর কথা বলা হয়, যাঁরা এই ধর্মের আধ্যাত্মিক চরিত্র। এঁরা পার্থিব বন্ধনগুলিকে জয় করেছেন। এঁদের তীর্থংকর নামেও অভিহিত করা হয়, কারণ এঁরা 'পুনর্জন্মে ভরা জীবননদীর উপর পবিত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ধমান

মহাবীর সর্বশেষ জিন। প্রথম জিন ছিলেন ঋষভনাথ, ২২তম অরিষ্টনেমিনাথ, ২৩তম পরেশনাথ—যিনি মহাবীরের তথাকথিত নির্বাণলাভের ২৫০ বছর আগে মারা যান। 'জিন চরিত' এঁদের জীবন নিয়ে লেখা। কিন্তু এটি লেখা হয় আনুমানিক ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী সময়কালে—ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে যথেষ্ট কল্পনা ও সংযোজন ঘটিয়ে এদের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। তবে সম্ভবত শেষ দুই 'জিন' ছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্র।

বুদ্ধের মতো মহাবীরও রাজপুত্র ছিলেন এবং ৩০ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে নির্বাণলাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। উভয়েই গাছের নিচে বসে মোক্ষলাভ করেন বলে বলা হয়। উভয়েই তথাকথিত নানা স্তূপ বা স্মৃতিচিহ্ন, চৈত্যবৃক্ষ, ধর্মচক্র, রত্নত্রয় এসবকে গুরুত্ব দেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুগামীরা এসবকে পূজা করে। ইন্দ্র, ব্রহ্ম, যক্ষ ইত্যাদি হিন্দু চরিত্রগুলিও উভয় ধর্মেই অনুপ্রবেশ লাভ করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের মত ঈশ্বর নির্ভরতা জৈনধর্মের নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার সমস্ত অংশ নিজস্ব, সনাতন নিয়মে উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে চলছে, এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ব্যাপারটি অপ্রাসঙ্গিক—এই বক্তব্যের বিচারেও জৈনধর্ম নাস্তিক ধর্ম।

তবে বৌদ্ধধর্ম থেকে জৈনধর্মের একটি বড় প্রভেদ হলো, জৈনধর্মে হিন্দুদের মতো কর্মফলে বিশ্বাস করা হয়। জন্মান্তরের কল্পনা তো বটেই, পরের জন্মে কে কীভাবে থাকবে তা আগের জন্মের কাজকর্মের উপর নির্ভর করে—এমন নির্ভেজাল কল্পনাও জৈনধর্মে স্বীকৃত। তবে পশুবলি ও চতুর্বর্ণভেদ প্রথা জৈনধর্মে কঠোরভাবে অস্বীকৃত। জৈনধর্মে কঠোরভাবে এবং যান্ত্রিক-ভাবে জীবহত্যা বন্ধ করা তথা অহিংসার কথাও বলা হয়। যান্ত্রিক আচার হিসেবে এরই প্রতিফলন ঘটে মুখে কাপড় চাপা দেওয়া, বসার বা চলার আগে জায়গা ঝাঁট দেওয়া, কঠোর নিরামিষ আহার ইত্যাদির মধ্যে—পাছে ছোটো পোকা-মাকড়ও মারা পড়ে। একই সঙ্গে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জীব ও অজীব এই দুভাগে ভাগ করা হয়, আর বলা হয় মানুষ তার জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে মূলত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন-যাপনের ফলে। জ্ঞানের দ্বারাই (যেমন ব্রাহ্মণদের তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞান) মানুষ তার জীবনের পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন করতে পারে—উপনিষদের এ ধরনের কথাবার্তাকে অস্বীকার করা হয়।

জৈন ধর্মে অহিংসা বা প্রাণীহত্যা না করার ব্যাপারটা একটি বদ্ধ সংস্কার

(obsession)-এ পরিণত হয়। এর ফলে কৃষিজীবী মানুষ একে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন, কারণ চাষবাস করতে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোটখাট প্রাণীহত্যা, কীটপতঙ্গ হত্যা হবেই। এছাড়া যে সব পেশা প্রাণী হত্যার সঙ্গে যুক্ত, ঐ সব পেশার মানুষদের মধ্যেও জৈনধর্ম প্রসার লাভ করে নি। মূলতঃ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের মধ্যে এবং যারা টাকার লেনদেন করে তাদের মধ্যে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির অন্যতম কারণ এটি—কারণ এধরনের পেশায় প্রাণীহত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংস্রব নেই। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্রোপকুলবর্তী যে সব ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য করত মূলত তাদের মধ্যে এটি গৃহীত হয়। জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হওয়ার আরেকটি কারণ হল,—চতুর্বর্ণভেদ প্রথার বৈশ্য তথা ব্যবসায়ীরা ঐ সময়কালে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়েছিল; কিন্তু আর্থিক অগ্রগতি ঘটলেও সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে তাদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরও পরে—শূদ্রদের কাছাকাছি। এই অপমানকর অস্বস্তিদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ তাঁদের সামনে খুলে দেয় জৈনধর্ম—যাতে এই ধরনের বিভেদের কোন স্থান ছিল না এবং যে ধর্ম অনুসরণ করে তাঁরা নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক সম্মান উভয়ই বাড়াতে সক্ষম হন।

নিয়মকানুন, চিন্তাভাবনা যাই থাক না কেন, অন্য ধর্মের মতো জৈনধর্মেও ক্ষমতাব দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়েছে, বিশেষ ব্যক্তিরা নিজেদের বিশিষ্ট মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। মহাবীরের জীবদ্দশাতেই তাঁর জামাই জমালী এ ধরনের একটি বিভাজনের নেতৃত্ব দেন। এরপর আরো সাত বার নানা ধরনের বিভেদ হয় এবং ৮০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শিবভূতির নেতৃত্বে যে বিভাজন ঘটে তার থেকে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামের দুই মূল উপদলের সৃষ্টি হয়। জৈন সন্ন্যাসীরা কোনো কাপড় পরবে, না উলঙ্গ থাকবে—মূলত এই বিতর্কের উপর ভিত্তি করে এই বিভাজন ঘটে। দিগম্বর (অন্য নাম বোটিকা) সন্ন্যাসীরা পার্থিব লজ্জা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে উলঙ্গ থাকেন, তাদের ভূষণ শুধু অম্বর বা আকাশ। (এই বিভাজনের সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে ৭৯-৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই তা ঘটে।)

এই বিভাজনের আগেই কিছু কিছু রাজা জৈনধর্ম গ্রহণ করেন বা তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বৌদ্ধধর্মের মতো এ ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য

আধিপত্যের বিরুদ্ধে শাসক হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা। অন্যান্য ধর্মের মতো জৈনধর্মেও কখনোই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করার কথা বলা হয় নি। বরং প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীও তার সুযোগ নিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় খ্রীস্ট পূর্বশতাব্দী সময়কালে কলিঙ্গের রাজা খারবেল জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। অশোকের নাতি, রাজা সম্প্রাতি-ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী সময়কালে কালকাচার্য জৈনধর্মের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুমান করা হয় ইনি বর্তমান ভিয়েতনামের আন্নাম অঞ্চলেও গেছিলেন। এঁর বোন ছিলেন সন্ন্যাসিনী। রাজা গর্দভিল্ল তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান। এই রাজাকে উচ্ছেদ করতে কালকাচার্য পশ্চিমভারত ও উজ্জয়িনীতে শকদের আমন্ত্রণ করে আনেন।

শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর মেতা অর্থবজ্র এক সময় সন্ন্যাসীদের জন্য মন্দিরে স্থিতু হয়ে বসবাস করার কথা বলেন (চৈত্যবাস)। পরবর্তীকালে এর থেকে শ্বেতাম্বরগোষ্ঠীর মধ্যে নানা দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়কালে দক্ষিণভারতের গঙ্গা, কদম্ব, চালুক্য (গুজরাট), রাষ্ট্রকূট ইত্যাদি সাম্রাজ্য জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সপ্তম শতাব্দী সময়কালে গুজরাট ও রাজস্থানের শাসকগোষ্ঠী শ্বেতাম্বর মতের অনুগামী হন। একাদশ শতাব্দী সময়কালে শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর সন্ন্যাসীরা আরো অজস্র ভাগ বা গচ্ছ-এ বিভক্ত হন। এ ধরনের ৮৪টি গচ্ছের উল্লেখ পাওয়া যায়—যায় অল্পই বর্তমানে তার কিছু অনুগামীদের টিকিয়ে রেখেছে, যেমন খরতর, তপা, অঞ্চল গচ্ছ ইত্যাদি। দিগম্বররাও পরে বিভক্ত হয়—বিষপন্থী ও ১৬২৬ সালে বানারসীদাসের প্রতিষ্ঠিত তেরাপন্থী ইত্যাদি।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মান শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র। মাত্র ৩৩ বছরে মারা গেলেও এই নিষ্ঠাবান জৈন অহিংসার নীতির সারবত্তার কথা বলেন এবং সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধী জৈনধর্মের এই যান্ত্রিক অহিংসাবাদ ও রাজচন্দ্রের চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রভাবিত হন। বেদের আমলের ব্যাপক পশুবলির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রয়োজনে ও প্রতিক্রিয়ায় দর্শন হিসেবে যে অহিংসবাদের জন্ম, আড়াই হাজার বছর পরে তাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা হলো। তার ফল কী হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে নানা বিতর্ক চলবে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, অধিকাংশ

ধর্মাবলম্বীরাই শত শত বছর আগে বিশেষ নেতৃত্বদায়ী ব্যক্তি যা বলে গেছেন তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ-অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পান। কেন ঐ সব কথাবার্তা বলা হয়েছিল, কোন পরিবেশে, কোন্ প্রয়োজনে সে সবের সৃষ্টি—তা ভুলে গিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত, ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে ঐ সব কথাবার্তাকে চিরন্তন ধ্রুব হিসেবে ধরে রাখা হয় প্রায় কোনো ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম নয় আমাদের পরবর্তী আলোচ্য শিখধর্মের প্রসঙ্গটিও।

শিখধর্ম

পালি ভাষায় 'শিক্‌খ' বা সংস্কৃত 'শিষ্য' শব্দ থেকে এসেছে 'শিখ' কথাটি—যার অর্থ অনুগামী। একদিকে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা, অন্যদিকে ইসলামের আগ্রাসী অনুপ্রবেশ—এই উভয়ের প্রতিবাদী হিসেবে সামাজিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল শিখধর্ম—এই ভারতীয় ভূখণ্ডেই। পরবর্তীকালে সামরিক ক্ষমতা আর গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টাও এর সঙ্গে মিশে যায়।

শিখধর্মের ইতিহাস পাঁচশত বছরেরও কম। হিন্দুধর্মের একটি রূপান্তর, মূলত ভক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলেই এই ধর্মের সৃষ্টি। দক্ষিণভারতে এই আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং রামানুজ (১০১৭-১১৩৭ খ্রীস্টাব্দ) একে উত্তরভারতে প্রচার করেন—সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভক্তি আন্দোলন এর ফলে ছড়িয়ে পড়ে। জাতিভেদ প্রথার ও ধর্মানুষ্ঠানের উপর শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বের প্রতিবাদী ছিল এই আন্দোলন; এ আন্দোলনের মুখ্য কথা হলো—ভগবান নানা নামের হলেও আসলে এক এবং ব্যক্তিগত ভক্তি ও প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় (অর্থাৎ এর জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ইত্যাদির প্রয়োজন নেই)—এ-ধরনের কথাবার্তা, সবই মায়া—এ জাতীয় তথাকথিত দর্শন এবং ঈশ্বরের নাম-গান মাহাত্ম্য (যার একটি রূপান্তরিত পর্যায় হচ্ছে কীর্তন)। এর পরে রহস্যবাদী, ধর্মীয় কবি কবির (১৪৪০-১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ, এই ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামের একটি বিভাজন, সুফি মতবাদের ঐক্য সাধন করেন এবং অনেক মানবতাবাদী মতবাদ প্রচার করেন। এর ফলে হিন্দু অ-হিন্দু, মুসলিম অ-মুসলিম বহু ব্যক্তিই তাঁর অনুসারী হন।

শিখধর্মের সৃষ্টির মধ্যে এই ভক্তি আন্দোলন ও সুফি মতবাদ—উভয়েরই প্রভাব পড়েছে। তবে শিখধর্মের মধ্যে নাম-জপ, ঈশ্বরের 'নাম-গান-মাহাত্ম্য

ইত্যাদির উপর এমন জোর দেওয়া হয় যে, একে 'নামমার্গ' হিসেবেও অনেকে অভিহিত করেন। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নানকের কথা বলা হয়। ইনি শিখদের দশ জন গুরুর প্রথম গুরু।

নানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বর্তমানের পাকিস্তানে—লাহোর থেকে ৪০ মাইল দূরে রাইভোই তালবন্দি গ্রামে। তাঁর বাবার কাজ ছিল খাজনা আদায় করা (রেভিনিউ কালেক্টার)। এঁরা ছিলেন বেদী বা বৈদিক হিন্দু, ক্ষত্রিয়দের মধ্যেকার একটি তথাকথিত নিচু জাত। নানক তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সুলতানপুরে, এক আফগান শাসকের হিসাবরক্ষক হিসেবে। এখানে মর্দানা নামের এক মুসলিম ছিলেন তাঁর চাকর। রেবেক (reb2c) নামে এক তারের বাজনা বাজানোয় ইনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।

এঁরা দুজনে মিলে একটি ক্যান্টিন গড়ে তোলেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে খেতে পারে। নানক হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের উপর ও অন্যান্য বিষয়ে নানা আধ্যাত্মিক গান রচনা করতেন, মর্দানা তাতে সুর দিয়ে গাইতেন। এই সুলতানপুরেই নাকি নানকের ঈশ্বর দর্শন ঘটে। একদিন নদীতে স্নান করতে করতে কোথায় উধাও হয়ে যান। তিন দিন পরে এসে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলিম এইভাবে মানুষের ভাগ করা উচিত নয়, সব মানুষ সমান, ইত্যাদি এবং এইভাবে আরেক গোষ্ঠী শিখদের সৃষ্টি করেন। মানবপ্রেম ও তাঁর নতুনতর 'বৈপ্লবিক' ধর্মীয় মতামত প্রচার করতে তিনি নাকি আসাম, সিংহল, লাদাখ, তিব্বত, মক্কা-মদিনাতেও গিয়েছিলেন।

তাঁর শেষজীবন কাটে এখনকার পাকিস্তানের করতারপুরে। এখানে তিনি প্রথম শিখ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি শিখদের দ্বিতীয় গুরু হিসেবে মনোনীত করে যান অঙ্গদকে (তাঁর গুরু পদের সময়কাল ১৫৩৯-৫২ খ্রীস্টাব্দ)।

৪র্থ গুরু হন অঙ্গদের জামাই রামদাস সোধি (১৫৭৪-৮১)। এরপর শুধু এই সোধি পরিবার থেকেই গুরু হতে থাকেন। পরের গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনমল (১৫৮১-১৬০৬), তারপর হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৪), এরপর এঁর নাতি হররাই (১৬৪৪-৬১)। হররাই ৮ম গুরু মনোনীত করেন তাঁর ৫ বছরের ছেলে হরিকৃষেণকে (১৬৬১-১৬৬৪)—মাত্র ৮ বছর বয়সে এই শিশু

গ্রুটিবসন্তে মারা যায়। নবম গুরু হন হরগোবিন্দের ছেলে তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)। ১৬৭৫-এর নভেম্বর মাসে দিল্লিতে মোগলরা তাঁকে হত্যা করে। মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে শিখরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। দশম গুরু গোবিন্দরাই (১৬৭৫-১৭০৮) এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন ও আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দেন। ১৬৯৯-এর ১৩ এপ্রিল (নববর্ষের দিন) গুরু গোবিন্দরাই শিখ'দের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে ধর্মীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। পাঁচজন শিখকে এই নতুনতর ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁদের নাম দেন খালসা। পার্সি শব্দ খালেস-এর অর্থ পবিত্র। তিনি খালসা পুরুষদের সাধারণ পদবি দেন 'সিং' (অর্থাৎ সিংহ) এবং মহিলাদের 'কাউর' (অর্থাৎ সিংহী)। খালসাদের জন্য পাঁচ 'ক'-এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলো—এগুলি হলো কেশ (না কাটা চুল—যে চুল কাটবে সে পতিত হবে), কাঙ্কা (অর্থাৎ চিরুনী), কিরপান, কছ (বিশেষ অন্তর্বাস) এবং কাড়া (হাতের বালা, যেটি শয়তানের বিরুদ্ধে গুরুর মন্ত্রপূত অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়; এটি খালসাদের মধ্যে তথা শিখদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বেরও প্রতীক এবং হিন্দুদের রাখী-র একটি পরিবর্তিত রূপ)। অবশ্য গোবিন্দরাই (অর্থাৎ গুরু গোবিন্দ সিং)-এর আগেও শিখদের মধ্যে এগুলির কিছু কিছু প্রচলন ছিল।

শিখধর্মে হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু ছাপ পড়েছে। যেমন বৈদিক রহস্যময়, অর্থহীন শব্দ 'ওঁ'-কে গ্রহণ করা হয় এবং সৃষ্টিকর্তা (বা 'কার')-এর মাহাত্ম্য সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 'ইক ওঁ কার'—সেই একমেবা-দ্বিতীয়ম্ সৃষ্টিকর্তাকে বোঝায় এবং শিখদের মধ্যে ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষা পাঞ্জাবীতে এটি একটি বিশেষ শ্রদ্ধেয় অক্ষরের রূপ পায়। অন্যদিকে শিখধর্মেও ইসলাম ধর্মের মত একেশ্বরবাদ স্বীকৃত, ঈশ্বরের কোনো ছবি বা মূর্তি নিষিদ্ধ, পুতুল পুজাও নিষিদ্ধ। সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির পুজা, গঙ্গাজলকে পবিত্র ভাবা—এসব বন্ধ করা হলো। হিন্দুদের বেদ সব হিন্দু পড়তে পারে না, কিন্তু মুসলিমদের কোরান সবাই পড়তে পারে। শিখদের ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ-ও সবার কাছে উন্মুক্ত—প্রতি শিখই তা পড়তে পারে। পঞ্চম গুরু অর্জুন এই আদি গ্রন্থ রচনা করেন—নানকের মৃত্যুর অনেক পরে। এই আদিগ্রন্থকে পরবর্তীকালে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজা শুরু হয় এবং গ্রন্থসাহেব (The Granth Personified) নাম দেওয়া হয়। ১৭০৮ সালে গুরু গোবিন্দ সিং

এর কিছু পরিমার্জনা করেন। তবে গুরু গোবিন্দ 'দশম গ্রন্থ' নামে আরেকটি ধর্মপুস্তক রচনা করেন—সব শিখ এটি গ্রহণ করেন নি। খালসাদের আচার, শৃঙ্খলা, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্বলিত বই-এর নাম 'রহতনামা'। এছাড়া আছে 'সৌশাখি' (একশ গল্প) নামে আরেকটি নীতিশিক্ষামূলক ধর্মগ্রন্থ।

গুরু গোবিন্দ সিং-এর সামরিক জীবন খুব একটা সফল হয় নি। তাঁর অধিকাংশ অনুগামী আর চার পুত্র মুসলিম শাসকদের (মোগল) সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। তিনি পাঞ্জাব ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের নানদেদ-এ তাঁকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তিনি ঘোষণা করে যান যে, তাঁর পরে আর কেউ গুরু হবে না। অর্থাৎ তিনিই শিখদের শেষ গুরু।

মোগলদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার যুদ্ধের নেতৃত্ব এরপর দেন বান্দা সিং বাহাদুর (জীবৎকাল ১৬৭০-১৭১৬)। আট বছর ধরে বান্দা মুসলিম শাসকদের প্রতিহত করে রাখেন, কিন্তু অবশেষে ৭০০ অনুচর সহ বন্দী হন এবং ১৭১৬-এর গ্রীষ্মকালে দিল্লিতে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এরপর খালসারা পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেন। ১৭৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে পারস্যের নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করার পর মোগলদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল ও মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে খালসারা সমতল এলাকায় নেমে আসেন এবং 'মিস্‌ল্‌স্' নামে নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করেন। এঁরা শহর ও গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে সুরক্ষার নাম করে অর্থ আদায় করতেও শুরু করেন। (পার্সি শব্দ 'মেসাল'-এর অর্থ উদাহরণ ও সমান—উভয়ই)।

১৭৪৭-১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে আহ্‌মদ শাহ দুরানির ক্রমাগত আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৬১ সালের তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা আফগানদের হাতে পরাজিত হন। এর ফলে ঐ এলাকায় শাসন ক্ষমতায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তাকে কাজে লাগিয়ে শিখরা পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

মুসলিমদের মত শিখরাও শেষ অব্দি ধর্মের সঙ্গে সামরিক ক্ষমতা ও নিজেদের স্বাধীনতাকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। শিখধর্মে সর্বধর্মের সমন্বয়ের কথা বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে নিজেই অন্য ধর্ম থেকে পৃথক একটি ধর্ম হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নানক যে গোঁড়ামি ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ঐ ধরনের বেড়ায় নিজেরাও আবদ্ধ হয়ে পড়েন। হিন্দুদের মতো জাতপাত না থাকলেও বা 'গুরু কা লঙ্গর'-এর মতো জায়গায় সবাই এক সঙ্গে খাওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকলেও শিখধর্মেও নিজ ধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যেই বিভাজন রয়েছে। এ ধরনের তিন শ্রেণীর মানুষ আছে শিখদের মধ্যে—জাঠ (মূলত কৃষিজীবী), অজাঠ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) ও মাজাহাবি (অস্পৃশ্য. যাদের একটু নিচু চোখে দেখা হয়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ।

অন্য সব ধর্মের মতো শিখধর্মও, কিছু ব্যক্তি, বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিলেন অন্য সব ধর্মের মতো শিখধর্মেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বা চিন্তাভাবনাকে রূপ দিতে বিভিন্ন বিভাজন ঘটেছে। নানকের বড় ছেলে শ্রীচাঁদ প্রথম এ-ধরনের একটি উপদলের সৃষ্টি করেন 'উদাসী' নাম দিয়ে। এঁর অনুগামীরা সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপন করেন ও মহন্ত' নাম নিয়ে গুরুদ্বারার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। ১৯২৫ সালে শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি (SGPC) তৈরি হওয়ার পর এই মহন্তদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সপ্তম গুরু হররাই অষ্টম গুরু হিসেবে নিতান্তই শিশু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হরিকৃষেণকে মনোনীত করার ফলে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরাই কিছু শিখকে ভাঙিয়ে আলাদা গোষ্ঠী গড়েন: দেরাদুনে এঁদের প্রধান কার্যালয় এখনো আছে।

খালসারাও পরে নানা উপদলে বিভক্ত হন। বান্দা বাহাদুর সিং-এর প্রত্যক্ষ অনুগামী 'বান্দাই খালসা' এখন আর প্রায় নেই। কিন্তু অন্য বিভাগ, যেমন নামধারী ও নিরংকারী-রা এখনো আছেন এবং তাঁরা নিজেদের জীবন্ত গুরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন।

শিখদের আরাধনার স্থান, মন্দিরের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ধর্মশালা বলা হতো যার অর্থ 'বিশ্বাসের স্থান'—পরে এর নাম দেওয়া হয় 'গুরুদ্বারা', যেটি নাকি 'গুরুর কাছে পৌঁছনোর পথ'।

অন্য প্রায় সব প্রচলিত ধর্মের অনুগামীদের মতো শিখরাও কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে অবশ্যপালনীয় বলে মনে করেন। যেমন বাচ্চা জন্মালে তার কয়েকদিন পরে তাকে গুরুদ্বারায় এনে আদিগ্রন্থ খোলা হয় এবং বাঁ দিকের পাতার প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে তার 'পাহুল' অনুষ্ঠান (baptize) করে 'অমৃত' দেওয়া হয় এবং খালসায় রূপান্তরিত করা হয়। বিয়ের সময় (আনন্দ করজ) বর-বৌকে আদিগ্রন্থের চারপাশে চারপাক ঘুরতে হয়। মৃত্যুর পর পোড়ানোর আগে অব্দি বিরামহীনভাবে আদিগ্রন্থ পড়া হয়। আর মৃতের দেহভস্ম বিপাসা বা গঙ্গায় ফেলা হয়। এইভাবেই নানা সংস্কারের স্বাতন্ত্র্যে শিখরা নিজেদের অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের থেকে আলাদা করে রাখেন—যা শুরুতে গুরু নানক ভাঙতে চেয়েছিলেন—এবং শুধু নানকই বা কেন, তথাকথিত সব ধর্মগুরুরাই প্রায় এধরনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কখনোই এসব ধর্মমত সব মানুষের মিলনস্থল হয়নি—তার একটি বড় কারণ হয়ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে দূর না করে নিছক কিছু আচারঅনুষ্ঠানগত সংশোধন করার চেষ্টা, অন্যদিকে ঈশ্বর ও নানা প্রাসঙ্গিক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখা।

বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ০·৩ ভাগ মানুষ শিখ ধর্মাবলম্বী। এঁরা ছড়িয়ে আছেন ২০টি দেশে। তবে সংখ্যাগত ও আনুপাতিক বিচারে মূলত ভারতে (জনসংখ্যার শতকরা ১·৯৭ ভাগ) ও কানাডায় (০·৩ ভাগ) এঁরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছেন।

* * *

এইভাবে ইহুদি (Judaism), হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্ট, ইসলাম বা শিখ—পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মকে মানুষই তার নিজের মতো করে তৈরি করেছে। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক সংস্কার-সাধন করা, কিছু প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সমস্ত ধর্মেরই একটি বড় দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে মানুষের মিথ্যা বিশ্বাস, কল্পনা আর আস্থা টিকিয়ে রাখা। বিশেষ সময়ে বিশেষ শাসকগোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এসব ধর্মকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

বর্তমানে, পৃথিবীতে এই সাতটি ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা মোট পৃথিবীবাসীর শতকরা ৭০·৭ ভাগ। এছাড়া শতকরা ২০·৯ জন আছেন যাঁরা কোনো তথাকথিত ধর্মে বিশ্বাস করেন না—নাস্তিক বা অধার্মিক ; তাদের একমাত্র 'ধর্ম' মনুষ্যত্বের ধর্ম, প্রধান পরিচয় মানুষ হিসেবে। বাকি শতকরা ৮·৪ ভাগ পৃথিবীবাসীর মধ্যে আরো অজস্র ছোটোবড় ধর্মমত

প্রচলিত। এদের কোনো কোনোটির ইতিহাস অতি প্রাচীন, কোনো কোনোটি আবার নিতান্তই হাল আমলের। কোনো কোনোটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ার মুখে, এখন আর অনুগামী নেই বললেই চলে। সামাজিক প্রয়োজন কমে গেলে বা ফুরিয়ে গেলে ঐ সব ধর্মমতও পরিমার্জিত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে বা লুপ্ত হয়ে গেছে, চিরন্তন হয়ে থাকতে পারে নি।

মেক্সিকোর অ্যাজটেক, গুয়াতেমালার মায়া, কলম্বিয়ার চিবচান বা পেরুর ইনকা—এসব প্রাচীন সভ্যতার দেবদেবী ও ধর্মাচরণ এখন অর্ধলুপ্ত বা প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত। কোয়েতজাল কোতল্ (সর্পদেবতা), তেজকাতলিপোকা (সূর্যদেবতা), পাচাকামাক ও পাচামামা (উর্বরতার দেবদেবী)—ইত্যাদি ধরনের যে সমস্ত দেবতারা আমেরিকার আদি অধিবাসীদের আরাধ্য ছিল, তারা এখন মানবসভ্যতার যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে। আর্যরা ভারত ভূখণ্ডে ঢোকার আগে মোহেনজোদাড়ো বা হরপ্পায় যে-সব দেবদেবীর পুজো করা হতো, তার অনেকগুলিই এখন আর মানুষের মনে জায়গা পায় না। আবার মাথায় শিংওয়ালা, তিনমুণ্ডুওয়ালা (?) যে পুরুষটির (দেবতার) ছবি সিন্ধু সভ্যতার মুদ্রা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়, সেটি পরবর্তীকালে তথাকথিত হিন্দুদেব ব্রহ্মা বা শিবের মতো দেবতার কল্পিত মূর্তিতে ছাপ ফেলেছে।

চীনের লৌকিক ধর্ম

অন্যদিকে যে-সব প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এখনো টিকে আছে তাদের মধ্যে অনুগামীর সংখ্যা বিচারে চীনের লৌকিক ধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৩৪ ভাগ মানুষ এই ধর্ম অনুসরণ করেন। চীন সহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে তো বটেই, পৃথিবীর মোট ৫৬টি দেশে ছড়িয়ে আছেন এঁরা। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ সময়কালে, ইন রাজবংশের রাজত্বকালে চীনের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের লিখিত ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন দাসব্যবস্থার উন্মেষ ঘটছে। পাশাপাশি একবংশীয়, গোষ্ঠীগত ঐক্যও প্রবল। টোটেম বিশ্বাসও ছিল ব্যাপক। অন্যদিকে ঈশ্বর সম্পর্কিত —তুলনামূলকভাবে উন্নত—চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। ঐ ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের অদ্ভুত অদ্ভুত উপায়ও অবলম্বন করা হতো। যেমন আগুনে কচ্ছপের খোল বা জন্তুর কাঁধের চওড়া হাড় ফেলে দেওয়া হতো। তারপর ঐ পুড়ে যাওয়া খোল বা হাড়ে যেভাবে ফাটল ধরত তা পড়ার চেষ্টা করা হতো। প্রচলিত কোনো অক্ষরের সঙ্গে মিল দেখে, অর্থ বার করা হতো।

ধীরে ধীরে পেশাগতভাবে পুরোহিত গোষ্ঠীরও জন্ম হয়। এরা কেউ ধর্মে দীক্ষা দিত ও ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করত ('বু'), কেউ পার্থিব আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করত ও এ-সম্পর্কে খোঁজখবর রাখত ('শি'), কেউ করত ওঝাগিরি ('উ'), কেউ বা বলি দেওয়া বা এ-ধরনের উৎসর্গের কাজকর্ম করত ('ঝু')। মানুষে মানুষে সামাজিক শ্রেণী-বিভাজনের ছাপ ধর্মাচরণের মধ্যেও পড়েছে। যেমন রাজা-রাজপুত্রদের আড়ম্বরপূর্ণ কবর আর সাধারণ মানুষের অনাড়ম্বর কবরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র ও তাকে ঘিরে অভিজাতশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতার জন্য পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করতেও পিছপা হতো না। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী সময়কালে এই সব রাজা, অভিজাতরা নিজেদের মতো করে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নানা তত্ত্ব ও অনুশাসনের জন্ম দিতে থাকে। সমগ্র সংস্কৃতি ও লিখিত সাহিত্য ছিল এদেরই একচেটিয়া।

এ-সবের প্রতিক্রিয়ায় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী সময়কালে হান-ফেই-এর নেতৃত্বে কিছু বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন 'ফাজিয়া' নামে একটি মতবাদের জন্ম হয়। এর মধ্যে নিছক রাজরাজড়া নয়--সাধারণ মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিফলন দেখা যায়। এসবের ফলে চীনের অন্যতম সরকারি ধর্ম তাও (Daoism) ধীরে ধীরে রূপ পায়। সমসাময়িক কিছু প্রাসঙ্গিক বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আভাসও এই প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। দুই বিপরীতের মিলন সবকিছুর মূলে—এ ধরনের চিন্তাভাবনা তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বও যে ঘটে তা ঐ দর্শনে অনুপস্থিত ছিল। এর ফলে যারা সমাজকে শাসন করে তারা শ্রম করবে না --এমন তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। ধনী ও দরিদ্রের সুষ্ঠু মিলনই ছিল এই দর্শনের কাম্য এবং সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উপায়। নিষ্ক্রিয়তা, শারীরিক শ্রম না করা, ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বীকৃতি পায়।

কনফুসিয়াসের মতবাদ

ভারতীয় ভূখণ্ডে গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মতাদর্শ প্রচারের সমসাময়িককালে চীন ভূখণ্ডে আরেক দার্শনিক ও ধর্মপ্রবক্তার জন্ম হয়—তিনি ছিলেন

কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। তাঁর মতাবলম্বীরা তাঁর নাম অনুসারেই বিশেষ ধর্মের জন্ম দেন। বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র ০·১ ভাগ মানুষ এই ধর্মমতে বিশ্বাসী এবং তারা মূলত মাত্র তিনটি দেশে এখন টিকে আছেন—এদের মধ্যে চীনেই তাঁরা এখনো আছেন কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়।

কনফুসিয়াসের মতবাদ ঐ সময়কার নৈতিক অনুশাসন ও মূল্যবোধের একটি সংকলিত রূপ। অনেকে একে ধর্ম না বলে বিশেষ দর্শন হিসেবে দেখেন। তবু প্রকৃত অর্থে এটিও একটি ধর্মই। প্রচলিত অর্থের ধর্ম বিশ্বাসে যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, আত্মা ইত্যাদির বিশ্বাস মিশে আছে, কনফুসিয়ান ধর্মের বইগুলিতে এসবেরও উল্লেখ আছে। জন্মান্তর বা মৃত্যু পরবর্তী কাল্পনিক জীবনের অস্তিত্বও এই ধর্মে স্বীকৃত। তবে এই ধর্মমতে পেশাদার পুরোহিত বা গুরুজাতীয় কেউ ছিল না। ব্যক্তি কনফুসিয়াসকেই প্রায় অবতার বা ঈশ্বরের আসনে বসানো হয়েছে। পরবর্তীকালে শতশত বছর ধরে কনফুসিয়ান ধর্ম চীন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এবং চীনের অন্যতম বৃহৎ ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যান্য ধর্মের মতো এই ধর্মকেও সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণী সুদক্ষভাবে নিজস্বার্থে ব্যবহার করে।

কনফুসিয়ান-ধর্মে আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার ওপর জোর দেওয়া হতো। পূর্বপুরুষ তথা বাবা-মায়ের প্রতি অবিচল ভক্তি ও আনুগত্য এবং তাদের আরাধনার ওপরও জোর দেওয়া হয়। পুত্রসন্তান না হওয়া মানে জীবনের সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার—এধরনের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের রাজাদের আমলে চাকরি পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হতো। এই পরীক্ষায় অবশ্য-পাঠ্য ছিল কনফুসিয়াসের গ্রন্থগুলি।

পরবর্তীকালে চীনে তাওধর্ম, কনফুসিয়ানধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—এ তিন ধরনের ধর্মই প্রধান ধর্মমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ক্ষমতালাভের লড়াইতে প্রায়শই জড়িয়ে পড়ত। তাও-পুরোহিতরা একসময় রাজকীয় ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে—যদিও এ-ধর্মে আগে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ না করে নিস্ক্রিয় থাকার কথা বলা হয়েছিল। এমনই ক্ষমতার লড়াইতে কনফুসিয়ান হান রাজত্ব, ১৮৪ খ্রীস্টাব্দে তাওপন্থী কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনে প্রায় ১,৫০০ কনফুসিয়ান মন্দির ও এক লক্ষ তাও-মন্দির ছিল। অবশ্য সরকারি ধর্ম মূলত ছিল কনফুসিয়ান। ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের পর সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এ-অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। কনফুসিয়ান ধর্মে রহস্যময় অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন জাতীয় কাজকর্ম ছিল না (যদিও এ-সবে বিশ্বাস ছিল), কিন্তু দৈনন্দিন রাজকার্যে তার প্রভাব ছিল সর্বগ্রাসী। সান-ইয়াৎ-সেন এসব বন্ধ করেন। মন্দির তথা ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা আলাদা করে দেন। স্কুলে, চাকরির পরীক্ষায় কনফুসিয়ান ধর্ম বাধ্যতামূলকভাবে পড়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তাও-ধর্মে অবশ্য অলৌকিক শক্তির ওপর আস্থা তথা এ-জাতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চালু ছিল। কিন্তু তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল—এরপর আরো দুর্বল হয়ে যায়। ১৯৪৯-এ চীনের মুক্তির পর এ-ব্যাপারে আরো বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রাচীন মন্দির ইত্যাদি সুরক্ষিত করে মিউজিয়াম করা হয়। সরকারি সমস্ত কাজে কোনো ধরনের ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়। ধর্মকে উৎসাহ দেওয়া হয় না. ধর্মকে বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবু এখনো চীনের বিশেষত গ্রামাঞ্চলে. কনফুসিয়ান-ধর্ম, তাও-ধর্ম তথা চীনের লৌকিক ধর্মকে আর বৌদ্ধধর্মকেও বেশ কিছু মানুষ অনুসরণ করেন।

শিন্টোধর্ম

চীনের প্রতিবেশী জাপানে যে প্রাচীন ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছিল তা শিন্টোধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমানে পৃথিবীর ০·১ ভাগ মানুষ এখনো এই ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং এরা ছড়িয়ে আছেন জাপান সহ পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশে। প্রাচীন জাপানের পুরোহিত স্থানীয় ব্যক্তিরা শুরুতে তিনটি দেবতার, পরে আরো দুটির এবং আরো পরে এক এক করে আরো পাঁচ জোড়া দেবতার কল্পনা করেন। তাদের কল্পনায় আকাশ ও পৃথিবী প্রথমে সৃষ্টি হয়। দেবতারা আকাশে থাকেন। প্রথমদিকের দেবতাদের কোনো নাম নেই। শেষ দুটি দেবতারই নাম ও মূর্তি আছে। এরা হচ্ছে ইজানাগি ও ইজানামি নামে দম্পতি। এরাই জাপানের দ্বীপপুঞ্জ, সূর্য ও তার দেবী আমাতেরাসু ও অন্যান্য দেবতাদের আর চন্দ্র, বজ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এবং এই সূর্যদেবী আমাতেরাসু নাকি জাপানের

প্রথম সম্রাট। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর জিম্মু তেন্নোকে সৃষ্টি করেছে।" স্পষ্টতই শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের কর্তৃত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সূর্যের সঙ্গে নিজেদের সৃষ্টিকে জুড়ে দিয়েছিল। এই সূর্য যে পৃথিবীর প্রাণ ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, ঐ বোধ—আদিমকাল থেকেই মানুষ উপলব্ধি করেছে। তাই সূর্যের থেকে যার সৃষ্টি সে যে সর্বোত্তম তাতে তো সন্দেহ নেই! মহাভারতের সূর্যবংশীয় রাজা থেকে শুরু করে বহু দেশের শাসকগোষ্ঠীই এই কৌশল অবলম্বন করেছে এবং তাকে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

জাপানের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাসে গোষ্ঠীদেবতার আরাধনা ছিল মুখ্য—যাকে বলা হতো 'কামি'—এর অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রধানতম ইত্যাদি। এ-ধরনের ধারণাকে কেন্দ্র করে নানা আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম হয়। কিন্তু ধর্ম হিসেবে এর আলাদা কোন নাম ছিল না। চতুর্থ শতাব্দীর সময়কালে চীন থেকে কনফুসিয়ান ধর্ম জাপানে অনুপ্রবেশ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোরিয়ার কিছু ব্যক্তি জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এর প্রায় এক'শ বছর পরে জাপানের সম্রাট, বৌদ্ধধর্মকে নিজের শাসনকার্যে ব্যবহার করেন এবং কয়েক দশকের মধ্যেই এটি জাপানের সরকারি ধর্মে পরিণত হয়।

অন্যদিকে জাপানের নিজস্ব ধর্মীয় কল্পনা এ-সব বহিরাগত ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিমার্জিত হতে থাকে। কামি-দেবতার আচার-অনুষ্ঠানকে চীনারা বলত শিন-টো নামে। এই চৈনিক নামটিই পরে জাপানের ঐ নামহীন, প্রাচীন, নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসাদির পরিচায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শিন্টোধর্মাবলম্বীদের অনেকেই বৌদ্ধ বা কনফুসিয়ান-ধর্মেও একই সঙ্গে বিশ্বাস করেন। আবার উভয়ের মধ্যে বিরোধও ঘটে।

পরে ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীস্টধর্ম জাপানে অনুপ্রবেশ করে। বিশেষত বহু দরিদ্র জাপানি কৃষক এই ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু পরে জাপানি শাসকরা এ-ধরনের বিধর্মী অনুপ্রবেশকে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হিসেবে অনুভব করেন এবং ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে জাপানে খ্রীস্টধর্ম নিষিদ্ধ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন ও কোরিয়ার প্রভাবকেও খর্ব করার জন্য কনফুসিয়ান ও বৌদ্ধধর্মকে হতমান করা হয়। এবং দেশের নিজস্ব প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস শিন্টোধর্মে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে মেইজি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী সামন্ততান্ত্রিক

অভিজাতদের হঠিয়ে দিয়ে উদার রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিন্টোধর্মকে জাপানের সরকারি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বর্তমানে জাপানে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর নেই। তবু শিন্টোধর্ম বেশ কিছু মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস হিসেবে টিকে আছে। জাপানের সম্রাটকে ঐ সূর্যের দেবী আমাতেরাসুর উত্তরসূরী হিসেবেই ভাবা হয়—কিন্তু সে শুধু খাতায় কলমে। শিন্টোধর্মে, পরজন্ম বা মৃত্যুর পরের অবস্থার কোনো কাল্পনিক ছবি আঁকা হয় না এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পৃথিবীর মানুষদের নিয়েই তার কারবার, পার্থিব ব্যাপার নিয়েই তার যা আচার-অনুষ্ঠান। আর এ-কারণেই হয়তো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর, ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে শিন্টোধর্মকে সরকারি ধর্ম হিসেবে গণ্য করার নিয়ম বাতিল করা, সম্রাটকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা ও জাপানিদের পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে মনে করা জাতীয় প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিকে অসার হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোনো গণবিক্ষোভ ঘটে নি।

জরথুষ্ট্রবাদ

জরথুষ্ট্রবাদ (Zoroastrianism) আরেকটি প্রাচীন ধর্ম, যা পারস্য (এখনকার ইরান) অঞ্চলের মানুষেরা সৃষ্টি করেন। বর্তমানে এই ধর্মের অনুসারীরা প্রধানত পার্সী নামে পরিচিত, সংখ্যায় এঁরা সারা পৃথিবীতে দেড় লক্ষেরও কম এবং মূলত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছেন। এই ধর্ম-এর প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা, এ কারণে একে মাজদাবাদ (Mazdaism) নামেও ডাকা হয়। জরথুষ্ট্রকে এই ধর্মের প্রচারক হিসেবে বলা হয়। এর প্রধান ধর্মপুস্তক আবেস্তা, তাই অনেকে একে আবেস্তাবাদ (Avestism) নামেও অভিহিত করান। আবার এই ধর্মের প্রধান দিক হচ্ছে আগুনকে পবিত্র ভেবে রক্ষা করা, পূজা করা ইত্যাদি—যে কারণে একে অগ্নি উপাসনা এবং এই ধর্মাবলম্বীদের অগ্নিউপাসক হিসেবেও বলা হয়।

জরথুষ্ট্র খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী সময়কালে পারস্যে জন্মান। (অনেকের মতে আরো আগে; কারো মতে আদৌ এ নামে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল না।) তিনিই আবেস্তাকে লিখিত রূপ দেন। জরথুষ্ট্রবাদ যথাসম্ভব উত্তর-পূর্ব পারস্যে (বর্তমানের আফগানিস্থান ও তাজিকিস্থান) বিকশিত

হয়। অবার অনেকের মতে আবেস্তা রচিত হয় উত্তর পশ্চিম পারস্যে— মিডিয়া (Midia) নামক স্থানে, যেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে এই তথাকথিত ধর্মপুস্তক প্রচলিত ছিল। আর পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে মাজি (Migi) নামক ধর্মীয়গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল তা মোটামুটি সুনিশ্চিত।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ সময় কালে পারস্যের একটি জনগোষ্ঠী. পূর্বদিকে ক্রমশঃ ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং আর্য নাম ধারণ করে (প্রকৃতপক্ষে আর্যভাষী)। তার আগে, ঐ প্রাগৈতিহাসিক সময়ে. এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে যে সব বিশ্বাস ও তথাকথিত ধর্মীয়আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেগুলি এই ভারতীয় আর্যভাষীরাও সঙ্গে করে আনেন। আবার সেগুলি পরবর্তীকালে গ্রন্থিত আবেস্তাতেও অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আবেস্তা-বাদ তথা জরথুস্ত্রবাদের অঙ্গীভূত হয়; যেমন পবিত্র পানীয় হাওম (haoma) (ভারতীয় সোমরস), আহুরা (ভারতীয় অসুর), দীব (ভারতীয় দেবতা), আন্দ্রা (বৈদিক ইন্দ্র), যিম (বৈদিক যম), সূর্যদেবতা মিথ্রা (এখনো ভারতে এই নামের দেবতার পূজা করা হয়) ইত্যাদি। অবশ্যি জরথুস্ত্রবাদের আহুরা ছিলেন আলো ওদয়ার 'দেবতা' আর দীব ছিলেন অন্ধকার ও পাপের 'দেবতা।' প্রধান আহুরা ছিলেন আহুরা মাজদা—তিনি সব ভাল জিনিষের সৃষ্টিকর্তা এবং এঁর শত্রু বা বিপরীত (কিন্তু যমজ ভাই) ছিলেন আংরা মইন্যু (Angra Mainyu) যিনি সব মন্দ. অপকারী জিনিষের সৃষ্টিকর্তা। এই দ্বৈতবাদ (অর্থাৎ একই ঈশ্বর ভালমন্দ সৃষ্টি করেছেন তা নয়) এই ধর্মের একটি বড় দিক।

আসলে, প্রাগৈতিহাসিক সময়কার দুই বিপরীত অর্থনীতি অনুসরণকারী আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার বিরোধ এই দ্বৈতবাদের মধ্যে প্রতিফলিত। নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসকারী, কৃষিজীবী গোষ্ঠী এবং যাযাবর গোষ্ঠী (যারা তখন যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থিতু হতে চাইছিল অর্থাৎ জমির মালিক হতে চাইছিল)—এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ স্বাভাবিক ভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল: পূর্বোক্ত গোষ্ঠী আহুরা-পন্থী (এঁরা পারস্যেই থেকে যান) এবং দ্বিতীয়টি দীব-পন্থী (অথবা এঁদের এই নামে অভিহিত করা হয়, কারণ দীব মানেই মন্দ; এই গোষ্ঠীই পারস্যে নিরাপদ স্থান না পেয়ে একসময় পূর্বদিকে পশ্চাদপসরন করতে করতে সিন্ধুউপত্যকায় আসেন, ধীরে ধীরে যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি, পশুপালন ইত্যাদির

সাহায্যে স্থিত্ হয়ে বসেন; এবং পরে এঁরাই ভারতীয় 'আর্য' হিসাবে অভিহিত হন এঁদের কাছে 'দীব' তখন হয়ে যান উপাস্য ও শুভ, আহুরা হয়ে যান অসুর ও মন্দ। ভারতীয় আর্যভাষীদের প্রথম বই ঋগবেদ-এর ভাষা আদি সংস্কৃত; এর অনেক শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। আবেস্তা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়েই এমন অনেক শব্দের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।)

পারস্যে থেকে যাওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম হয় সুসংহত ধর্মমত—জরথুষ্ট্র বাদ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী সময়কালে, পশ্চিম পারস্যের পুরোহিতগোষ্ঠী মাজি-দের হটিয়ে দিয়ে, আর্কিমেনিডী ক্ষমতায় আসেন এবং আহুরা মাজদা-কে রাষ্ট্রীয় উপাস্য দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিন করেন। যথাসম্ভব এই সময়ই জরথুষ্ট্র ধর্মীয় সংস্কারক-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে রাজার স্বার্থরক্ষার জন্য আহুরা-মাজদা-কেন্দ্রিক মাজদাবাদ তথা জরথুষ্ট্রবাদকে সুসংহত ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ধর্মে নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, পবিত্র আগুনকে রক্ষা করা ইত্যাদি গুরুত্ব পায়, কিন্তু অনুষ্ঠা নাদি করার অধিকার একমাত্র পুরোহিত স্থানীয় আথ্রাবান্ (Athravanos)-দের। মৃতদেহ এতে চরম অপবিত্র জিনিষ হিসেবে গণ্য হয় এবং কোনভাবে যাতে মাটি, জল ও আগুনের সংস্পর্শে না আসে তার দিকে কঠোর নজর দেওয়া হয়। দাখমা (**dakhma**) নামে একটি উঁচু স্তম্ভের উপর মৃতদেহ রেখে দেওয়ার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে, শকুনিরাই তা খেয়ে ফেলবে। দাখমা শয়তান বা দীব-দের জায়গা। জন্মান্তরের কথা না বল্লেও, এই ধর্মে মৃত্যুর পরে স্বর্গ (আহুরা মাজদা-য় রাজ্য) ও নরক (আংরা মইন্যু-র রাজ্য) ইত্যাদিতে যাওয়ার কথা ভাবা হয়—জীবনে ভালকাজ বা মন্দ কাজের উপর এই 'ভবিতব্য' নির্ভর করে। এইভাবে নৈতিকতা ও মানবতাবাদী নানা কাজ ও চিন্তা এই ধর্মেও স্বাভাবিক ভাবেই আছে—যা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য এবং যা, মানুষকে অনুসরণ করতে বলা হয় এক কল্পিত শাস্তির ভয় দেখিয়ে। অন্যদিকে ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের 'আত্মা-'র ভবিতব্যের কথাও বলা হয়, এবং এইভাবে একটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী করে, বিশেষত সেই সব ধর্ম থেকে যে সব ধর্ম মানুষের তথা তার 'আত্মার' ভবিতব্য জন্মসূত্রেই নির্ধারিত বলে প্রচার করে।

এই ধর্মে মিথরা (সূর্য) দেবতা প্রচণ্ড শক্তিশালী, বীর; ২৫শে ডিসেম্বর

তাঁর 'জন্মদিন' পালন করা হয়, যে দিনটি পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

৭ম শতাব্দী সময়কালে আরবীয় মুসলিমদের দ্বারা ইরান অধিকারের আগে অব্দি জরথুস্ত্রবাদ সেখানকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম-এর স্রোতে তা ভেসে যায় বা অন্যান্য নানা স্থানীয ধর্মের সঙ্গে মিশে নানা রূপ ও গোষ্ঠীর জন্ম দেয় যেমন পলিসিয়ান (৭ম শতাব্দী), বোগোমি (১০ম শতাব্দী), ক্যাথারিস্ট ও আলবিজেনিস (১২-১৩শ শতাব্দী) ইত্যাদি, কিংবা কুর্দদের মধ্যে, ককেশাস অঞ্চলে (প্রায় একই ধরনের স্তম্ভে মৃতদেহের সৎকার করা হয়) ইত্যাদি। ইরানের গবব (gabr) নামক ক্ষুদ্র অগ্নিউপাসক গোষ্ঠী কিংবা বোম্বাই-গুজরাটের পার্সিদের মধ্যে (ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ০'০১ জন জরথুস্ত্রবাদী) এই ধর্মবিশ্বাসের অবশেষ এখনো আছে।

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস কিভাবে সময় ও সমাজের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, মানুষের প্রয়োজনে বিকাশের ও অপ্রয়োজনে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়—তার আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ জরথুস্ত্রবাদ—যা অন্যান্য সব ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি।

শামান-তন্ত্র

আবার অন্যদিকে মূলত অপার্থিব, অলৌকিক শক্তির ওপর যে-অগাধ বিশ্বাস নিয়ে, যে-ধর্ম অতি প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে **শামানতন্ত্র বা শামানিজম্‌**। বর্তমানে পৃথিবীর ০'২ ভাগ মানুষ শামানিস্ট এবং এরা ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর প্রায় ১০টি দেশে। তবে সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর নানা দেশের আদিম মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই শামানপন্থা বিচ্ছিন্ন-ভাবে রয়েছে।

শামান (Shaman) কথাটির দ্বারা এমন একজনকে বোঝায় যে বিশেষ এক মানসিক অবস্থায় বিশেষ ধরনের আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ অপার্থিব, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এবং এই যোগাযোগের ফলে নানাবিধ কাজ করে দিতে পারে, যেমন রোগ সারানো, বিপদমুক্তি, ফসল ফলানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এই যোগাযোগের ফলে নানা 'ঐশ্বরিক নির্দেশ', 'অপার্থিব সংবাদ' ইত্যাদিও সংগ্রহ করতে পারে। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে আফ্রিকা, রাশিয়া কিংবা আন্দামান, কোরিয়া বা মেক্সিকো—পৃথিবীর নানা দেশেই এই শামানরা ছড়িয়ে আছে। আমাদের এখানে বা অন্যত্রও ঠাকুরের বা ভূতের ভর হওয়া,

বা বিশেষ দেবদেবীর দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি আসলে এই আদিম শামান-পন্থারই একটি রূপ।

মানুষের চিন্তাভাবনা বিকাশের একেবারে শুরুর দিকে সে যে প্রকৃতির সর্বকিছুর মূলে একটি রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। মানুষের কল্পনার এই বিশেষ দিকটিকে বলা হয় Animatism ; কল্পনার এই প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবন, জীবজন্তুর জীবন, প্রাকৃতিক সব ঘটনা, এসবের মূলে কায়াহীন, অবয়বহীন এক শক্তি বা আত্মার কথা ভাবা হয়। আদিম মানুষ এই শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টার যে-প্রক্রিয়া পৃথকভাবে বিশেষ আচারপদ্ধতি, বিশ্বাস, ইত্যাদি নিয়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে, তাকে আলাদা একটি ধর্ম তথা শামান-পন্থা (Shamanism) হিসেবে বলা হয়।

পরবর্তীকালের মানুষ এই শক্তি বা 'আত্মা'-কে বিশেষ আকারে কল্পনা করেছে—সৃষ্টি হয়েছে দেবদেবীর চেহারা। কিন্তু এখনো পৃথিবীর বহু আদিবাসীগোষ্ঠী ঐ কায়াহীন অলৌকিক আত্মায় গভীরভাবে বিশ্বাস করে এবং তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নিজের গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ একজনের ওপর দায়িত্ব দেয়। এই দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগাযোগকারী ব্যক্তিই শামান যাকে অলৌকিক ক্ষমতাধর, অপার্থিব শক্তির প্রতিভূ ইত্যাদি হিসেবে ভাবা হয়।

আসলে এই শামানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক অর্থাৎ মস্তিষ্কের রোগে ভোগা ব্যক্তি। এখন জানা গেছে হিস্টেরিয়া, মৃগী, স্কিজোফ্রেনিয়া, হরমোনজাত কিছু রোগ, মস্তিষ্কের অপুষ্টি ইত্যাদি নানা ধরনের রোগ রয়েছে, যে-সব রোগের রোগীরা অস্বাভাবিক ও মিথ্যা কিছু অনুভূতির শিকার হয়। অসুস্থতা ছাড়া, কৃত্রিমভাবেও এই বিভ্রমের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। গাঁজা, ভাঙ, চরস, ধুতুরা (হয়ত বা সোমরসও) বা আধুনিককালের এল এস ডি ইত্যাদি শরীর গ্রহণ করলে, মস্তিষ্ক তাদের রাসায়নিক প্রভাবে নানা বিভ্রম ও তথাকথিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra Sensory Perception বা ESP) লাভ করা যায়, অর্থাৎ শামান বা ঈশ্বরের দূত হওয়া যায়। আবার কোরিয়ায় জন্মান্ধ ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী শামান হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। ঘোরের মধ্যে, আচ্ছন্ন, আবিষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ খিঁচুনি বা ফিটের সময় ও পরে, তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা বলে-অপার্থিব শক্তির ওপর বিশ্বাসের কারণে ঐ-সব শক্তি তথা আত্মার ব্যাপারেও নানাবিধ কথাবার্তা বলে,—যা

আসলে মিথ্যা কিছু অনুভূতি মাত্র। একইভাবে নানা ধরনের বিভ্রমও (hallucination ও illusion) তার ঘটে। এই সব মিথ্যা অভিজ্ঞতাগুলিকে সে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলে ; অপার্থিব শক্তি, আত্মা ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস যাদের গভীর ঐ গরিষ্ঠ সংখ্যক সরলবিশ্বাসী 'সুস্থ' ব্যক্তি ঐ অসুস্থ ব্যক্তির রহস্যময় কথাকে বিশ্বাস করে এবং নিজের কল্পনাকে আরো জোরদার করে তোলে। হাজার হাজার বছর আগে এভাবেই শামান-ঐতিহ্যের শুরু। আর সম্প্রতিকালে, বিগত দু-আড়াই হাজার বছরের মধ্যে, মানুষের লিখিত সাহিত্য, সামাজিক ও অন্যান্য জ্ঞান উন্নত হয়েছে ; এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচীন ঐ সব শামানদেরই উত্তরসূরীরা নানাবিধ শিক্ষামূলক কথাবার্তা বলে, সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার করে এবং এইভাবে জীবন্ত, অবতার ধর্মগুরু, বাবাজি বা স্বামীজি, ঈশ্বরের প্রতিভূ ইত্যাদি নাম নিয়েছে। তথাকথিত ধ্যানস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া ও তার নির্দেশ শোনা (hallucination), বা তুরীয় অবস্থায় বিষ্ঠাকে মিষ্টান্নভাবা বা বাচ্চা ছেলেকে কৃষ্ণ ভাবা (illusion)-এর মতো ব্যাপার ঘটে। প্রকৃতঅর্থে এসবই পূর্বোক্ত নানাবিধ রোগের লক্ষণ মাত্র। তথাকথিত যে-সব ধর্মপ্রচারক দাবি করেছেন যে, তারা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন ও নির্দেশ শুনেছেন, স্পষ্টত তারা সবাই এই গোষ্ঠীভুক্ত—যদিও তাদের সামাজিক ভিন্নতর ভূমিকাও রয়েছে।

শামান এই সব অবতার এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ওঝা-গুনিন ইত্যাদিদেরও পূর্বসূরী বা সমগোত্রীয়। এস্কিমো, আফ্রিকার আদিবাসী, আন্দামান নিকোবরের আদিবাসী, কোরিয়া বা অন্যান্য নানা দেশেই এখনো টিকে থাকা আদিবাসীদের মধ্যে, এই শামানতন্ত্র আদিমরূপে বর্তমান।

এস্কিমোরা যেমন মনে করে, নাতির শরীরে তার ঠাকুর্দার বা তার আগেকার কোনো পূর্বপুরুষের আত্মা আসে। শামান 'ঠিক করে দেয়' কার আত্মা ঐ শিশুর মধ্যে এসেছে। বড় হলে নিজের 'আত্মা' সৃষ্টি হয়ে যায়। তার আগে অব্দি এস্কিমোরা তাদের শিশুকে শত অপরাধ করলেও শাস্তি দেয় না, কারণ শিশুকে শাস্তি দেওয়া তো আসলে শ্রদ্ধেয় কোনো পূর্বপুরুষকে শাস্তি দেওয়া।

মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার খরাপ্রবণ এলাকায় শামানদের কাজ হচ্ছে বৃষ্টি আনা, কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে বা শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা গোষ্ঠীর মধ্যে তার কাজ শিকারকে সফল করে তোলা। ক্যালিফোর্নিয়ার রেড ইন্ডিয়ানদের শামানরা মূলত

চিকিৎসার কাজ করে। জড়ি-বুটি গাছ-গাছড়ার ব্যবহারের সঙ্গে ঐ অপার্থিব শক্তি বা আত্মাকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করে তারা।

পরবর্তীকালে সৃষ্টি হওয়া অন্যান্য নানা ধর্মমতে এই শামানতন্ত্রের ছাপ পড়েছে। যেমন মুসলিমদের দরবেশরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে বলে দাবি করে এবং প্রকৃত অর্থে নিছক শামানদেরই অনুকরণ করে। চীনের তাওপন্থীরাও শামানপন্থার অনুসরণ করে, আবিষ্ট অবস্থায় উন্মত্তের মতো নাচতে নাচতে চীৎকার করে ও অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে বলে ভাবে ; আমাদের দেশে কীর্তন করতে করতে বা নামগান, নামজপ ইত্যাদি তথাকথিত নানা ধর্মীয় প্রক্রিয়ার সময় সম্মোহিত বা আত্মসম্মোহিত অবস্থায় অনেকে যেমন অদ্ভুত সব অস্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে বলে শোনা যায়। সথাকথিত হিন্দুদের নানা প্রাচীন ধর্ম-সাহিত্যেও শামান- দেরই মতো ধ্যান করে দেবদেবীর দেখা পাওয়ার বা কথাবার্তা শোনার কথা বলা হয়েছে। হাল আমলেও এমন হিন্দু শামান তথা অসুস্থ ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেছে, যে অবতার ছাপ পেয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে।

তাই আসলে শামানতন্ত্র বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র ০·২ ভাগ মানুষ (এদের প্রায় সবাই নানা আদিবাসী গোষ্ঠী) অনুসরণ করে বলে বলা হলেও, অন্যান্য আধুনিক ধর্ম ও বিপুল সংখ্যক অ-আদিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই পরোক্ষে এর ছাপ পড়েছে।

আদিবাসী ধর্ম

অন্যদিকে শামানতন্ত্রের মতো আরো নানা ধরনের আদিম ধর্মবিশ্বাস পৃথিবীর নানা দেশের মূলত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলন রয়েছে। এদের এক কথায় **আদিবাসী ধর্ম (Tribal religion)** বলা হলেও—বিভিন্ন এলাকায় তার বিভিন্ন রূপ, আধুনিক ইসলাম-বৌদ্ধ-হিন্দু ইত্যাদির মতো একটা সুসংবদ্ধ নয়। আর এদের অধিকাংশের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শামানতন্ত্রেরও মিশ্রণ রয়েছে। তবু কিছু স্বাতন্ত্রের জন্য শামানতন্ত্রকে এই 'আদিবাসীধর্ম' থেকে আলাদা করা হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই আদিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ১·৭ ভাগ এবং তারা ৯৮টি দেশে ছড়িয়ে আছে।

বাহাই ধর্ম

অন্যদিকে আধুনিকতম যে ধর্মমত বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, সেটি হলো **বাহাই ধর্ম (Bahaism)**। অনুগামীর সংখ্যা বিচারে এ ধর্মের দুর্বলতা স্পষ্ট—মাত্র ০·১ ভাগ পৃথিবীবাসী এর অনুগামী। কিন্তু এর শক্তির আঁচ পাওয়া যায় ব্যাপকতা থেকে—পৃথিবীর ২০৫টি দেশে ছড়িয়ে আছেন এর অনুগামীরা। ধর্মের বিচারে, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও নাস্তিক অ-ধার্মিক ব্যক্তিরা ছাড়া, অন্য কোনো বিশেষ ধর্মের অনুগামীরা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে নেই। অবশ্য, মূলত এটি কিছু শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও ধনী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত। এর বৈভবের আভাস পাওয়া যায় দিল্লির সুবিশাল লোটাস টেম্পল থেকে—যে-ধবনের সৌধ আরো বহু দেশেই বাহাইপন্থীরা গড়ে তুলেছেন।

বাহাই-ধর্মের ভিত্তি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পারস্য (ইরান)-এর দরিদ্র কৃষক ও শহরের হতদরিদ্র মানুষদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ইসলামধর্মের প্রতি অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এদের তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দেন শিরাজের মহম্মদ আলি—যিনি নিজেকে ব্যাব (Bab) নামে ডাকতেন যার অর্থ জনগণ ও ঈশ্বরের মধ্যেকার সংযোগকারী। এই আন্দোলন ব্যাবাইট আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। মুসলিমদের মধ্যেকার নানা বৈষম্য, বিভেদ, দল-উপদলকে ভেঙে, সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বাণী প্রচার করে এই আন্দোলন। এর মধ্যে রহস্যময় কিছু ক্রিয়াকলাপও ছিল এবং ঈশ্বরের নির্দেশে নতুন ধরনের মানবিক নিয়মাবলীর কথা প্রচার করা হয়। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এর নেতাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তবু আন্দোলনের রেশ মিলিয়ে যায় নি। মহম্মদ আলির অন্যতম অনুগামী, মীর্জা হুসেন আলি নুরীর নেতৃত্বে কিছু পরিমার্জিত আকারে ঐ আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারিত হয়। শুধু মুসলিমদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রীতিষ্ঠার কথা বলা হয়। মুসলিমদের ধর্মান্ধতা, বিধর্মীদের প্রতি হিংস্র মনোভাব,—এ-সবের বিরোধিতা করে তিনি ক্ষমা ও অহিংস প্রতিবাদের কথা বলেন। নিরাকার ঈশ্বরেব কাছে নীরব প্রার্থনার কথা বলা হয় এ-ধর্মে। মীর্জা হুসেন নিজেকে বাহা-ও ল্লাহ, নামে অভিহিত করেন এবং এ-থেকেই তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বাহাই।

*   *   *

এই ভাবে বর্তমান পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলির সৃষ্টি, মানুষের হাতেই (বা মনোজগতেই)। এখানে আলোচিত ধর্মগুলি ছাড়া আরো প্রায় ৭০ টি ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত—তবে অনুগামীর সংখ্যা বিচারে তাদের এখনকার প্রভাব নগন্য ; শতকরা মাত্র ২.৯ জন পৃথিবীবাসী এতগুলি ধর্মের আশ্রয়ে রয়েছেন। ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি, ক্ষমতা ও ঘটনা, আত্মা ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠানও এই সমস্ত ধর্মেরই সাধারণ লক্ষণ। পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, ঐ প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের কিছু মানুষ ঈশ্বর-আত্মা-অলৌকিকত্ব সম্পর্কিত ব্যাপক বিশ্বাসের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে সত্যকে এবং শুধু মানুষের পার্থিব কথাকে তুলে ধরেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীরা এদের নাস্তিক বা অ-ধার্মিক—এ-ধরনের নেতিবাচক বিশেষণে ভূষিত করলেও, বর্তমানে পৃথিবীতে মাত্র বিগত কয়েক দশকের মধ্যেই এরা একটি সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি পাঁচজনের কমপক্ষে একজন ব্যক্তিই সরকারিভাবে এই দলভুক্ত।

নাস্তিকতা, নিরীশ্বরবাদ বা অধার্মিকতা

নাস্তিকতা বা অধার্মিকতা প্রচলিত অর্থের বিশেষ আরেকটি ধর্ম নয়—বরং ধর্মের বিপরীত একটি দিক। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে এই দিকটিকে এমন নেতিবাচকভাবে পরিচিত করাতে হয়। তার প্রধান কারণ মানুষের চেতনায় এই দিকটি বিকশিত হয়েছে ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিকতা তথা ধার্মিকতার পরবর্তীকালে।

একটি শিশু তার অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকের কাছে অসহায়তার জন্য নানা ঘটনার পেছনে অবাস্তব, মিথ্যা নানা কিছুর কল্পনা করে। রহস্যময় একটি শক্তি তথা ভূত-প্রেত, অলৌকিক ক্ষমতাধর কোনো কিছুর চিন্তা তার মাথায় ঢোকে। চারপাশের বয়স্করা এই কল্পনাকে শক্তিশালী করে দেয়। মানবসভ্যতার শৈশবকালেও মানুষ একইভাবে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা করেছে ; সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বর চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি।

সবাই না হলেও, অনেক শিশুই বড় হয়ে তার শৈশবের মিথ্যা কল্পনাগুলিকে দূর করতে পারে। জ্ঞান ও যুক্তিবোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সত্যকে জানে বা জানার চেষ্টা করে। একইভাবে, মানবসভ্যতা সময়ের পথ বেয়ে

এগিয়ে চলার সময়, কিছু মানুষ আগেকার কাল্পনিক নানা ধারণার ভ্রান্তিকে বুঝতে পারে এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মের কাল্পনিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। তখন আগেকার কল্পনাকে অস্বীকার করেই তার সত্য-উপলব্ধি বা জ্ঞানকে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু ততদিনে ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি সামাজিক যেমন, তেমনি ভাষাগত ভিত্তিও পেয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে এই অস্বীকারের ব্যাপারটা নেতিবাচকভাবেই প্রকাশ করতে হয়।

নাস্তিকতা (Atheism)-এর কাছাকাছি আরেকটি চিন্তা হলো অজ্ঞাবাদ বা অ্যাগনস্টিসিজম (Agnosticism)। নাস্তিকতা ঈশ্বর বা এই জাতীয় কোনো শক্তির অস্তিত্বকে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে সরাসরি অস্বীকার করে; অন্যদিকে অ্যাগনস্টিসিজম-এ 'ঈশ্বর আছে কি নেই' এ ধরনের প্রশ্ন উত্তরের অতীত বা এ-ধরনের প্রশ্ন করাই ভিত্তিহীন—এভাবে ব্যাপারটিকে হাজির করা হয়। অজ্ঞাবাদীদের কাছে—নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনোকিছু জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রীক শব্দ 'অ্যাগনস্টস' থেকে এর উৎপত্তি; 'অ্যাগনস্টস' কথাটির অর্থ 'অজ্ঞেয়'। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাস হাক্সলি একটি ভিন্নতর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে কথাটা ব্যবহার শুরু করেন—এই দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি ও খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসের বিরোধী, আবার চূড়ান্ত নাস্তিকতা থেকেও ভিন্ন। ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আরেকটি যে দার্শনিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে তা হলো সন্দেহবাদ (Skepticism); কোনো কিছুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে—প্রশ্ন তোলা, সন্দেহ করা, বিতর্ক করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়। ল্যাটিন শব্দ scepticus বা গ্রীক skeptikos-এর অর্থ অনুসন্ধান বা enquring।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির তথা মানুষের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগের ফলে, অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)-এর বিপরীতে যুক্তিবাদ (Rationalism)-ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। যুক্তিবাদী চিন্তায়, জ্ঞানের উৎস ও কোনো বিশেষ কিছু সম্পর্কে জ্ঞানের একমাত্র পরীক্ষা বা প্রমাণ হলো যুক্তি ও কারণ (reason)। সব কিছুর পেছনেই যুক্তি থাকবে—যুক্তিহীন কোনো বিশ্বাস বা জ্ঞান আসলে অজ্ঞতা। তাই ঈশ্বর, আত্মা, অলৌকিক ক্ষমতা ও ঘটনা ইত্যাদি জাতীয় নানা কল্পনার পেছনে যদি যুক্তি না থাকে, তবে এগুলি অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আবার, যুক্তিবাদী চিন্তা প্রক্রিয়ায়, কেউ

যদি কারণ দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্যিই প্রমাণ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য।

এই সব দার্শনিক পদ্ধতির পাশাপাশি নাস্তিক্যবাদ (Atheism) ঈশ্বর বা এই জাতীয় ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। এই চিন্তার বিকাশে অজ্ঞাবাদ, সন্দেহবাদ, যুক্তিবাদ ইত্যাদি পদ্ধতি অবশ্যই পুষ্টি জুগিয়েছে। তবে ইয়োরোপে নাস্তিক্যবাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্লেটোর প্রায় সমকালীন, ডেমোক্রিটাস ও এপিকুরাস (খ্রী. পূ. ৩৪১—২৭০) নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে যুক্তিবিন্যাস করেন এবং বস্তুবাদ-তথা নাস্তিক্যবাদ-বিরোধী প্লেটোর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। এই ডেমোক্রিটাসদের চিন্তাতেই বস্তুবাদ (Materialism) (যথাসম্ভব প্রথম) আভাসিত হয়। এইভাবে, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা গ্রীক সভ্যতায় এবং তার ধারাবাহিকতায় বিকশিত পাশ্চাত্য পরিমণ্ডলে, ঈশ্বর জাতীয় কোনো কিছুর আদিম কল্পনাকে অস্বীকার করে, প্রকৃত সত্য জানার প্রচেষ্টা হয়েছিল অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেই।

এবং মোটামুটি এই সময়কাল থেকেই, পৃথিবীর আরেক প্রাচীন সভ্যতা, যা ভারতীয় ভূখণ্ডে বিকশিত হয়েছে, সেখানেও ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনার বিরোধী চিন্তা বিকশিত হয়েছে এবং নানা দার্শনিক মত ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতের মতো প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য যা প্রকৃত অর্থে ধর্মশাস্ত্রেরই নামান্তর, সেগুলিতে এ-ধরনের মত ও ব্যক্তির উল্লেখ সংক্ষিপ্ত হলেও রয়েছে। প্রচলিত ধর্মবিরোধী ও ঈশ্বর চিন্তা-বিরোধী এই সব মত ও ব্যক্তিরা সমাজে একটি ক্ষুদ্রতর শক্তি হলেও, উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে ছিলই এবং তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। জনসমক্ষে তাঁদের হেয় করতে ও তাঁদের চিন্তাপদ্ধতির বিরোধিতা করার জন্য ঐ সব ধর্মগ্রন্থে এঁদেরও স্থান দিতে হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মচিন্তার শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ও অনেক প্রভাবশালী,—তার বিরোধী চিন্তা ঐভাবে বিশেষ কোনো গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় না—বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখাপত্র ছাড়া। কিংবা তাদের বিকৃত করা হয়েছে।

চরকসংহিতায় যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। 'অনুমান' করার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে, যা আগে দেখা গেছে, সে সম্পর্কে বা তার ওপর ভিত্তি করেই কেবল পরবর্তী অনুমান করা যায়ঃ

এ কারণে. আত্মা, কর্মফল, জন্মান্তর জাতীয় যে-ব্যাপারগুলির পেছনে আগে দেখা কোনো কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই, সেগুলি প্রকৃত অনুমান নয়, নিছক কল্পনা। তবে পারিপার্শ্বিক পুরোহিত ও শাসকগোষ্ঠী প্রবল শক্তিশালী থাকায়, চরকসংহিতায় সরাসরি এভাবে ঈশ্বর. আত্মা, কর্মফল জাতীয় ব্যাপারগুলিকে অস্বীকার করা হয় নি ; কিছুটা কৌশল ও আপস করতে হয়েছে।*

এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনেও অনুরূপ প্রত্যক্ষনির্ভর যুক্তিবাদী অনুমান পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি অন্তত ছয়টি শাখায় সুসংহত হয়। এগলি হল ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত। গুপ্ত যুগে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার তথাকথিত স্বর্ণযুগে (৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত-১-এর দ্বারা যার সূচনা) এই ছয়টি দার্শনিক পদ্ধতি তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে, কিন্তু এগুলির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক আগেই—হয়তো বা বেদ-উপনিষদের আমলেই। এদের মধ্যে সাংখ্য দর্শন মূলত ছিল নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক্য দর্শন ; তবে বস্তু ও আত্মার দ্বৈতভাব এতে স্বীকৃত। ন্যায় ছিল মূলত যুক্তিবাদী—কল্পনা ও ভাববাদী চিন্তার প্রশ্রয় এতে ছিল না ; যুক্তি তর্ক ছাড়া কোন কিছুকে গ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল না। অবশ্যি ন্যায় সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত বৌদ্ধ দার্শনিক ও অধ্যাপকদের

---

* আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল—যা অনেকের মতে অথর্ববেদের একটি শাখা। বহু জনের বহুদিনের অভিজ্ঞতার সারসংকলন এই আয়ুর্বেদ। এর থেকে অগ্নিবেশ-এর দ্বারা অগ্নিবেশতন্ত্র রচিত হয়। পরে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়কালে আত্রেয় ও সুশ্রুত নিজস্ব সংহিতা রচনা করেন। চরক এঁদের পরবর্তী ; তিনি ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে যথাসম্ভব কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। চরক এবং দৃঢ়বল নামে আরেক চিকিৎসক অগ্নিবেশতন্ত্র অবলম্বনে চরক সংহিতা রচনা করেন। আত্রেয় ছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) ও সুশ্রুত শল্যবিদ্যায় (Surgery) পারদর্শী। ঔপধেনব, ঔরভ্র, পুষ্কলাবত, নাগার্জুন প্রমুখের দ্বারা সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার ও পরিমার্জনা হয়। বৈদিক আমলের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য যুগে নানা কুসংস্কার ও ভাববাদী মানসিকতা দৃঢ়মূল হতে থাকে এবং চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষতঃ শল্যবিদ্যাকে, হতমান ও ঘৃণ্য কাজ হিসেবে গণ্য করার কাজ শুরু হয়। (বৌদ্ধ যুগের অহিংসার তত্ত্বও শল্যবিদ্যার বাধাস্বরূপ হয়।) ব্রাহ্মণ্য মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ও তার ধারাবাহিকতায় প্রাচীন ভারতীয় এই সব চিকিৎসা গ্রন্থের বস্তুবাদী দিকগুলির বিকৃতি সাধন করা হতে থাকে।

যুক্তিবাদী কথাবার্তাকে খণ্ডন করে, তাঁদের সঙ্গে যথার্থ বিতর্ক করার জন্য। বৈশেষিক দর্শনও অন্তত বস্তুবাদী দর্শন ছিল ; এতে বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাণু দিয়ে তৈরী এবং তা আত্মা নয়। অবশ্য পরে বস্তু ও আত্মার আলাদা জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। যোগ-এর বক্তব্য ছিল শরীর, মন ও অনুভূতির যথার্থ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই চরম সত্য উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে ধ্যান, পূজা, যজ্ঞ, প্রার্থনা জাতীয় কাজের উপযোগিতা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা হয়। এই দর্শনেও অন্তত কিছুটা বস্তুবাদী চিন্তার আভাস রয়েছে। মীমাংসার মধ্যেও অনেকে বস্তুবাদের লক্ষণ অনুভব করেন, তবে এটির সৃষ্টি হয় বেদ-কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ব্রাহ্মণদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের উৎস যে বেদ, ঐ বেদ-এর মূল অনুশাসনকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যে মহিমা বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সহ নানা বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দর্শনের সাহায্যে খর্ব হয়েছিল ; মীমাংসার প্রধান সমর্থন ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা। (আর বেদান্ত ছিল চূড়ান্তভাবে বস্তুবাদ বিরোধী বা নিরীশ্বরবাদী চিন্তার বিরোধী। অব্রাহ্মণ্য সমস্ত চিন্তাভাবনাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করে এর প্রতিষ্ঠা। সবই মায়া, সমস্ত কিছুর মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনই প্রতি মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য—ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা এটি প্রচার করে। স্পষ্টতঃই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার ঐ অনুকূল সময়ে এই দর্শনই ব্যাপক প্রচার লাভ করে, হিন্দু শাসকগোষ্ঠী এর সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং জনমানসে তার শিকড় গেড়ে দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিরা বেদান্ত দর্শনকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি দর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন।*

ভারতের উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে ক্রমঅগ্রসরমান বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়ায়, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে নাস্তিক্যবাদী-তথা নিরীশ্বরবাদী চিন্তা বিকশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সঞ্জয় বেলাথিপুত্তের নেতৃত্বে সন্দেহবাদ যা ছিল বেদবিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী এবং অনেক পরে পাশ্চাত্যে বিকশিত সন্দেহবাদের যা ছিল প্রায় সমগোত্রীয়। এছাড়া পকুত কাত্যায়নের নেতৃত্বে কণাবাদ, অজিত কেসকম্বলিনের নেতৃত্বে

---

* "বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস।—" ইত্যাদি (শ্রী প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর সম্ভার' থেকে)

বস্তুবাদ, পূরণ কাসপ-এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় তথা আইনী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে (প্রতিষ্ঠানবিরোধি বা antiestablishment) মতবাদ ইত্যাদিও যে গড়ে উঠেছিল তা আগে বৌদ্ধধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঐ সামাজিক পরিবেশে প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রতি মানুষের ঘৃণা বা মোহমুক্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল এগুলি। আর তার অন্যতম সুসংহত রূপ ছিল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিকাশ। এ সবের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ইত্যাদি দর্শনের বিকাশে কাজ করেছে তা স্পষ্ট।

(এবং এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে যে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ও বিবর্তন ঘটছিল—তার সঙ্গেই নিঃসন্দেহে সম্পর্কযুক্ত ছিল এই ব্যাপক বেদ-ব্রাহ্মণবিরোধী, নাস্তিক্যবাদী-নিরীশ্বরবাদী চিন্তা। অবশ্য তা সমাজের চালিকাশক্তির ভূমিকা নিতে পেরেছিল কিনা বা গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো কিনা তা যথাসম্ভব এখনো অমীমাংসিত।)

এসবের আগে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্বভাববাদ ও ভূতবাদ নামে দুই চিন্তা-পদ্ধতির উল্লেখ আছে। স্বভাববাদ অনুযায়ী কোনো বস্তুর নিজস্ব গুণ বা স্বভাবের জন্যই সবকিছু ঘটে থাকে, এই স্বভাবের বাইরে কোনো কিছু ঘটাও সম্ভব নয়। পৃথিবীর তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তার নিজস্ব গুণাবলী নিয়েই চলছে। বাতাস বইছে, জল তরল বা লোহা শক্ত—এগুলির গুণই তাই, কেউ সৃষ্টি করেছে বলে এগুলি এরকম নয়। স্বভাববাদের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হচ্ছে ভূতবাদ। ভূতবাদীরা চরম বস্তুবাদী; ভূতবস্তু ছাড়া অন্যকিছু এঁদের কাছে গণ্য নয়। এঁরা অদৃষ্ট তথা কর্মফলে সামান্যতম বিশ্বাসও করেন না, যুক্তিবাদী চিন্তায় তাঁরা আপসহীন।

এবং এই বস্তুবাদী চিন্তাপদ্ধতির অন্যতম সুসংহত একটি রূপ হচ্ছে লোকায়ত দর্শন তথা চার্বাকবাদ। এই দর্শন মহাভারতের আমলেই একটি প্রতিষ্ঠিত রূপ পেয়ে গিয়েছিল। মহাভারতে একাধিকস্থানে এই দর্শন ও তাঁর অনুসারী ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে—অবশ্যই হতমান-অপমান করে। শঙ্করাচার্য থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় ভাববাদী দার্শনিকেরাও এই বস্তুবাদী দর্শনকে অবিরাম গালাগালি করে গেছেন। কিন্তু এ-থেকে যা স্পষ্ট তা হলো, এই দর্শন শাসকগোষ্ঠীর দর্শন নয়, এটি সাধারণ মানুষের অর্থাৎ সাধারণের চিন্তা, তাদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের দর্শন। লোকগাথা হিসেবে এই

দর্শনের নানা বক্তব্য ছড়িয়ে ছিল। 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' মাধবাচার্য তার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' গ্রন্থ থেকে এগুলির কয়েকটির অনুবাদ এখানে সামান্য পরিবর্তিত আকারে উল্লেখ করা যায়। বলা হয়েছে : 'স্বর্গ, মুক্তি, পরলোকগামী আত্মা বলে কিছু নেই। বর্ণাশ্রম অনুযায়ী করা ক্রিয়াকাণ্ড নিতান্তই নিষ্ফল।

'যাদের বুদ্ধি নেই, পরিশ্রম করার ক্ষমতা (বা ইচ্ছা) নেই, তারাই বা তাদেরই জন্য, যজ্ঞ, বেদ, দণ্ড ধরে গায়ে ছাই লেপে সন্ন্যাসীর ভেক—এসব সৃষ্টি করেছে বা করা হয়েছে।

'যজ্ঞে নিহত প্রাণী স্বর্গে যায় বলে বলা হয়। তাহলে এমন যজ্ঞে যজমান তার পিতা (বা প্রিয়জনকে) মারে না কেন—তাহলে তো তারা সরাসরি স্বর্গে যেতে পারে।

'কেউ মারা গেলে তার শ্রাদ্ধ করলে যদি তার তৃপ্তি হয়, তবে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পর তেল ঢাললে তার আবার জ্বলে ওঠার কথা।

'মারা যাওয়ার পর কারোর উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া মিথ্যা—তা না হলে তো কেউ বিদেশে গেলে তার উদ্দেশ্যে ঘরে বসে পিণ্ড দিলেই তার খিদে মিটে যাওয়ার কথা।

'ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসেবেই শ্রাদ্ধ, প্রেতকর্ম ইত্যাদির ব্যবস্থা—এছাড়া এসবের অন্য কোনো উপযোগিতা নেই।

'অর্থহীন বেদমন্ত্র ধূর্ত পণ্ডিতদের কথাবার্তা ; যারা এ-সব রচনা করেছে তারা ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর'·· ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সবের মধ্যে সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বাতিল না করলেও, পরোক্ষভাবে ঐ কাল্পিত পরমাত্মাকে কখনো স্বীকারও করা হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে এই ধরনের নানা প্রতিবাদী চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা বেদ, ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ বা পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল জাতীয় ষড়যন্ত্রমূলক বা কল্পনাভিত্তিক প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কণাদ (ভিন্ন নাম উলুক) যে দর্শনের প্রচার করেন তাতে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ নেই। তাই অনেকে কণাদ-দর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন হিসেবেই গণ্য করেন। শঙ্করাচার্য, কপিল প্রমুখ পৌরাণিক চরিত্ররাও নাস্তিক্যবাদ তথা বেদবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের পিসতুত ভাই অরিষ্টনেমী-ও বেদবিরোধী বক্তব্য (যা হিন্দুদের মতে নাস্তিক্যবাদ) তুলে ধরেছিলেন। পরেশনাথও

ছিলেন এমনই এক প্রাচীন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ও মণ্ডূকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনার এক পুত্র ছিলেন বল—ইনি ছিলেন চরম ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। এছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখ মনীষীরাও বেদ-ব্রাহ্মণ বিরোধী চিন্তার প্রচার করেন। চার্বাককেও বলা হয় দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। অবশ্য বৃহস্পতি নাকি দৈত্যদের বিনাশ করার জন্যই তাদের মধ্যে এমন তথাকথিত 'বেদ-বিরোধী লোকায়ত তথা বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার করেন। স্পষ্টতঃই, এমন কাহিনী প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল জনসমক্ষে বস্তুবাদী দর্শনকে হেয় করা। যেন—বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস করা মানেই নিজের সর্বনাশ করা।

ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে বস্তুবাদী চিন্তা ও নাস্তিক্য দর্শন নানা সময়ে বিকশিত হলেও, ভারতীয় পরিমণ্ডলের মতো এতটা চূড়ান্ত বিরোধিতা, লাঞ্ছনা ও অপমান তাকে সহ্য করতে হয়নি। এ কারণে গ্রীক দর্শনের বস্তু-বাদী অংশের ধারাবাহিকতায় নাস্তিক্য-দর্শন বা তার পূর্বসূরী চিন্তার ধারা-বাহিক ইতিহাস ও গ্রন্থাবলী পাওয়া গেলেও, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা কিছু উল্লেখ ছাড়া অন্য কিছু সুসংবদ্ধরূপে পাওয়া মুশকিল। তার একটি বড় কারণ, প্রাচীন ভারতের স্বভাববাদ-ভূতবাদ-সাংখ্য-ন্যায-বৈশেষিক বা যোগ, কিংবা আয়ুর্বেদ বা চরক সুশ্রুত সংহিতার মত শাস্ত্রাদির মধ্যে যে বস্তুবাদী কিংবা নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক্য চিন্তা ছিল, সেগুলিকে সচেতনভাবে বিকৃত করা হয়েছে—যেমন পরে আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (যেমন জ্যোতির্বিদ্যা) বরাহমিহিরের মত ব্যক্তিদের দ্বারা (যেমন জ্যোতিষবিদ্যায়) বিকৃত হয়েছে। আর এর ফলে নাস্তিক্য-দর্শনের পূর্বসূরী প্রবক্তারা ভারতীয় অঞ্চলে থাকলেও, সম্প্রতিকালে এর বিকাশ মূলত ঘটেছে পাশ্চাত্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর মন নিয়ে সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা, শিল্প-বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, মার্কসবাদের মতো একটি অতি প্রভাবশালী সামাজিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শের বিকাশ ইত্যাদিও ইয়োরোপীয় এলাকায় ঘটার পেছনে এই ঐতিহাসিক দিকটি নিশ্চয়ই কিছুটা ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতার যে পর্যায়ে কল্পিত ঈশ্বরকেন্দ্রিক আদর্শ ও রাষ্ট্র গড়ার পরিমণ্ডল ছিল, ঐ পর্যায়ে এই ভারতেই একটি স্তর পর্যন্ত মানবসভ্যতা, উৎপাদন, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য—এ সবের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু সময়ের

সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাববাদী ও কল্পিত বায়বীয় চিন্তাভাবনা দূর করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ায়, একদা উন্নত ভারতীয় সভ্যতা অধোগতি লাভ করেছে।

নাস্তিক্য-দর্শন মূলগতভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শন হলেও তার ওপর 'বিদেশী' ছাপ মারার প্রবণতা আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এই দর্শন যে ভারতীয় ভূখণ্ডেও যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিকভাবে অবিতর্কিত। তবে এ দেশের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, শাসকগোষ্ঠী এবং পরবর্তীকালে বিদেশী পণ্ডিতেরা, এ দেশের বস্তুবাদী, নাস্তিক্যবাদী বা নিরীশ্বরবাদী ঐতিহ্যের দিকটিকে হতমান করেছেন। আর সত্যকে দেশী বা বিদেশী হিসেবে ভাগও করা যায় না। সত্যেন বসুর নামানুসারী 'বোসন'-ই হোক, বা নিউটন আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মই হোক—সত্য আন্তর্জাতিকভাবেই সত্য।

আধুনিককালে নাস্তিক্যবাদ (atheism) বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে সরাসরি অস্তিত্বহীন হিসেবে স্বীকার করা বা আরো সঠিকভাবে বললে, ঈশ্বর বিশ্বাসকে মিথ্যা বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা এবং যে-সব ধর্মকে এই ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়, সেই ধরনের সমস্ত ধর্মেও বিশ্বাস না করা। [এভাবে নাস্তিক (atheist) ও অধার্মিক বা ধর্মহীন (non-religious) প্রায় সমার্থক।] ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মানুষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে—তা এই চিন্তায় বাতিল। প্রাসঙ্গিকভাবে নাস্তিকরা আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন না—কিন্তু এই অবিশ্বাস না থাকলেও কেউ নাস্তিক হতেই পারেন, কারণ ঈশ্বরে অবিশ্বাসই আক্ষরিক অর্থে নাস্তিকতার প্রধান লক্ষণ। স্পষ্টত যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক বা যুক্তিবাদী তাঁরা 'নাস্তিক' শব্দটির অর্থগত ও ব্যঞ্জনাগত সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন। পরিভাষাগত সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। Atheism-এর বাংলা নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ—দুটোই (সংসদ অভিধান)। কিন্তু হিন্দুদের কাছে, নাস্তিক বলতে বেদ (ও চতুর্বর্ণ)-বিরোধী ব্যক্তিদের বোঝায়—সরাসরি নিরীশ্বর-বাদীদের নয়। অন্যদিকে বর্তমানে সাধারণ ভাবে প্রচলিত ভাবার্থ অনুযায়ী নাস্তিক বলতে এমন একজনকে বোঝায়, যিনি ঈশ্বর ও সংশ্লিষ্ট ধর্মাদিতে বিশ্বাস করেন না।

বহু ধরনের চিন্তাপদ্ধতি ও দার্শনিক প্রক্রিয়া এই আধুনিক নাস্তিক্যবাদ সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতের কপিল, কণাদ, চার্বাক, বৃহস্পতি,

অরিষ্টনেমী, বল, বুদ্ধ, মহাবীর ইত্যাদি (যদি এঁরা সবাই ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে থাকেন) বহু বৈপ্লবিক চিন্তাবিদের মতো, সাম্প্রতিককালের বহু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌ও এই উপলব্ধির বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের চার্বাক দর্শন, কণাদ দর্শন, ন্যায় শাস্ত্র, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি যেমন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নাস্তিক্যবাদের স্বপক্ষে বলেছে, ইয়োরোপীয় অঞ্চলেও এমনই নানা চিন্তাপদ্ধতি ছিল—যার কথা আগেই বলা হয়েছে (অজ্ঞাবাদ, সন্দেহবাদ ইত্যাদি)।

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ছিলেন অজ্ঞাবাদী। তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব বিকশিত করেন, সেটি খ্রীস্টধর্ম ও ইহুদিধর্মের কল্পিত সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিশ্বাসের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত হানে। পরে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ঐ ডারউইন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বর বিশ্বাসের উৎস প্রসঙ্গে বিশ্লেষণী বক্তব্য রাখেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে নিক্কোলো মাকিয়াভেলি রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করার কথা বলেন। তখন শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব এত বেশি ছিল যে, ব্যাপারটি একটি বৈপ্লবিক রূপ পায় এবং পরোক্ষভাবে নাস্তিক্য-বাদের বিকাশে সাহায্য করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেভিড হিউম, এমানুয়েল কান্ট-এর মতো ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাবলীর বিরুদ্ধে বিতর্ক করেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানুষের নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার বলে মনে করেন। তারা নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে শুধু বস্তুগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করেন এবং চিরাচরিত ঈশ্বরতত্ত্বকে অস্বীকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রকাশ ঘটে—এঁরা ব্রিটিশ অভিজ্ঞতা-বাদ (empiricism)-এর সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে রেনে দেকার্ত-এর যান্ত্রিক বা বস্তুবাদী তত্ত্বের সমন্বয় ঘটান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুডভিগ ফয়েররাখ (১৮০৪-৭২) সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, ঈশ্বর আসলে মানুষেরই চিন্তাভাবনার একটি রূপ মাত্র এবং তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করার ব্যাপারটিকে মানুষের মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই ধারাবাহিকতায় কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করেন ; ধর্ম যে নিছকই মানবিক একটি ব্যাপার এবং ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস যে মানুষকে তার নিজস্বতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে ব্যাপারে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য রাখেন।

মার্কসবাদ মূলগতভাবে নাস্তিক্যদর্শন নয়, তবে মার্কসীয় দর্শনের অনিবার্য সিদ্ধান্ত ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ এবং আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল, ধর্ম ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্তিও। মার্কস কোনো না কোনো ভবিষ্যতে ধর্মের অবলুপ্তির কথা বলেন; তাঁর মতে ঈশ্বর ও অলৌকিক শক্তিভিত্তিক এই প্রচলিত ধর্ম নিপীড়িত মানুষের বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস ও অন্যতম অসহায় আশ্রয়স্থল, হৃদয়হীন পৃথিবীতে ধর্ম মানুষের কাছে এক আশ্বাসদায়ী হৃদয়।

নাস্তিক্যবাদী দর্শনের আরেকটি ধারা অস্তিত্ববাদী (existentialist) চিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ফ্রিডরিখ নিৎসে (১৮৪৪-১৯০০)-র মতো দার্শনিকেরা এর প্রবক্তা। তিনি 'ঈশ্বরের মৃত্যু'-র কথা বলেন—অর্থাৎ মানুষের চেতনা থেকে ঈশ্বর-এর পরিপূর্ণ অবলুপ্তি। তাঁর মতে এটি সম্ভব পরিপূর্ণ নেতিবাদ (nihilism)-এর মাধ্যমে এবং এর ফলে মানুষ নিজে নিজস্ব পরিপূর্ণতার দিকে মুক্তভাবে এগোতে পারবে, নিজ জীবনের মূলগত তাৎপর্য স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বিংশ শতাব্দীতে আলবার্ট কাম্যু, জাঁ পল সার্ত্র-এর মতো মনীষীরা এই চিন্তার ধারাবাহিকতায় বিশ্লেষণ করেন যে, সর্ব অর্থে মানুষের 'মুক্তি'-র জন্য ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার পবিপূর্ণ অবলুপ্তি একটি প্রাথমিক শর্ত।

আধুনিককালে নাস্তিক্যবাদের আরেকটি বড় সমর্থক হচ্ছে তার্কিক ইতিবাদ (logical positivism)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে কি যাবে না—এই প্রশ্নের বিচারে ইতিবাদীরা নাস্তিক নন, তাঁরা নাস্তিক এই অর্থে যে, তাঁদের মতে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাটি সম্পর্কেই কোনো আলোচনা অসম্ভব এবং অপ্রামাণ্য ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো কথা বলাটাই নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। হিউম, টমাস হাক্সলি, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ চিন্তাবিদরা এই ইতিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অতি হাল আমলের (১৯৩৬) বইপত্রে (যেমন Language, Truth and Logic ; A. J. Ayer) ঈশ্বরতত্ত্ব, নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞাবাদ ইত্যাদি ঈশ্বর সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনাকেই অনর্থক বা মিথ্যা (ungenuine) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কণাদ থেকে কাম্যু বা 'চার্বাক' থেকে মার্কস—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে সব মনীষীরা ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের কল্পনার ধোঁয়াশা

দূর করে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকৃত সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই-ই মানুষের সমাজ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, চেতনা ইত্যাদির ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে নাস্তিক্যবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত হাল আমলে আরো সুদৃঢ় হয়েছে, প্রাণ-এর সৃষ্টির পেছনে বস্তুর বিকল্পহীন ভূমিকার নিঃসন্দেহ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মধ্য দিয়ে। স্ট্যানলি মিলার ও তার উত্তরসূরী বহু বৈজ্ঞানিকের বহু পরীক্ষায় এটি আজ জানা গেছে, মানুষসহ সমস্ত প্রাণী-উদ্ভিদের এই অপার রহস্যময় প্রাণের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে জড় বস্তুর অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া। দেড় বা দুই হাজার কোটি বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর কিভাবে ধাপে ধাপে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পার্থিব পরিমণ্ডল আর প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে, তা আজ মোটামুটি জানা গেছে। নাস্তিক হোন বা নাই হোন, এসব বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় এটি আজ প্রমাণিত যে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক কোনো পরম পুরুষ তথা ঈশ্বরের কোনো ভূমিকাই নেই পৃথিবী ও প্রাণ সৃষ্টির পেছনে। বিগত কয়েকবছরের পরীক্ষায় হাতেনাতে মানুষ জেনেছে যে, আত্মা, পরমাত্মা তথা সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বাস্তবে অসম্ভব—তাদের অস্তিত্ব শুধু মানুষেরই কল্পনায়, অজ্ঞতায়, অসহায়তায়।

এই কাল্পনিক ঈশ্বর সম্পর্কে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের দ্বিধাহীন বিশ্বাস থাকলেও, ঈশ্বর-অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। বরং নাস্তিক্যবাদী চিন্তার মধ্য দিয়ে যখনই মানবিক ও বৈপ্লবিক বা সংস্কারমূলক গুণাবলী বিকশিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন বহু সাধারণ মানুষই তার দিকে এগিয়ে এসেছেন। বুদ্ধ বা মার্কস্-এর অনুগামী কোটি কোটি মানুষই শুধু এর উদাহরণ নন, নাস্তিকতার প্রচারক বহু চিন্তাবিদের সমর্থনেই নানা সময়ে বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। এঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলত সংগঠিত হয়েছে কায়েমী স্বার্থ বা শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে ও উসকানিতে, যারা নিজেদের ও সাধারণ মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসকে শাসনের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। চার্বাক বা বুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের শাস্ত্রকাররা তো নিছক গালাগালি বর্ষণ করেছেন একসময়। অন্যত্রও কমবেশি এই ব্যাপারই ঘটেছে।

তবু নাস্তিকতার বিপদ সম্পর্কে কিছু মতামত অবশ্যই বিচার্য। যেমন, সাধারণ সরলবিশ্বাসী মানুষ এখনো চায় কোনো এক সর্বশক্তিমানের আশ্রয়ে বা ভরসায় থাকতে। এর ফলে সে মানসিক সাহস পায়, যে সাহস তার দুঃখতাপিত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভরা জীবনে বেঁচে থাকার ও লড়াই করার উৎসাহ জোগায়। ঈশ্বর বা এই জাতীয় ধারণার অস্তিত্ব না থাকলে, এরা একটি মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তার ওপর একই গুণাবলী, ভরসা ও অন্ধবিশ্বাস আরোপ করবে। এবং বাস্তবত অতীতে বুদ্ধের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটেছে; সম্প্রতি মার্কস বা মাও সে তুঙ-এর মতো দার্শনিকের ক্ষেত্রেও এটি ঘটা অসম্ভব নয়।

আর এভাবেই নাস্তিক্যবাদী চিন্তার অনুসরণ একটি চরম সাহসিক কাজ। এটি শুধু চারপাশের ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘু হওয়ার বিপদ নয়; মানসিকভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা, অলীক হলেও ভরসা করার মতো যে ঐশ্বরিক আশ্রয় পায়, নাস্তিকদের কাছে এই মানসিক ভরসার এরকম কোনো কেন্দ্র নেই—তাকে নির্ভর করতে হয় শুধু নিজের ও নিজের চারপাশের মানুষের ওপর, বাস্তব প্রকৃতি ও মানবিক সমাজের ওপর।

নাস্তিকতার আরেকটি অসুবিধার কথা ভাবা হয়, তা হলো মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কিত। ঈশ্বর-ভীতি ও এ সংক্রান্ত পাপ-পুণ্যের ধারণা যদি না থাকে, তবে মানুষ আর ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টাই করবে এবং আধুনিককালের আইন-কানুন প্রণয়ন করেও এ মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বহু ধার্মিক ব্যক্তিই আপাতভাবে সৎ ও মানবতাবাদী জীবন যাপন করেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নানা ধর্ম বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশের সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, মানুষের মধ্যেকার ঐক্য গড়ে তুলবার দায়িত্ব পালন করেছে। তাহলেও নাস্তিক্যবাদী চিন্তাভাবনা এই ঈশ্বর ও ধর্মের বিকল্প হতে পারে কি-না সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে।

কিন্তু এই বিতর্ক প্রায়শই অন্ধ ও যুক্তিহীনভাবে এগোয়। মূল্যবোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নিয়মাবলী যুগে যুগে দেশে দেশে পাল্টায়। এগুলি ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত, সনাতন বা চিরন্তন কখনোই নয়; মানুষই তাদের সৃষ্টি ক'রে তাকে 'ধর্ম' নাম দেয়, ঈশ্বরের নাম করে চালায়। নাস্তিক্যবাদী চিন্তায় তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসন অবশ্যই নেই, কিন্তু সাধারণ

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে নাস্তিক ও ধর্মহীন বা অধার্মিক ব্যক্তির শতকরা হিসাব

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬.৪ জন (৮৬ কোটি ৬০ লক্ষ) ছিলেন 'অধার্মিক' ব্যক্তি অর্থাৎ এঁরা প্রচলিত কোনো ধর্মপরিচয়ে নিজেদের পরিচিত করান না (বা মুক্তচিন্তার, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ; এঁদের মধ্যে অ্যাগনস্টিকরাও আছেন)। আর নাস্তিক ব্যক্তি শতকরা ৪.৪ জন (২৩ কোটি ৩০ লক্ষ) (এঁদের মধ্যে সন্দেহবাদী বা স্কেপটিক, ধর্মবিরোধী ব্যক্তিরাও আছেন)। এঁরা ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর যথাক্রমে ২২০ টি ও ১৩০ টি দেশে। নাস্তিক্যবাদ ও অধার্মিকতা কাছাকাছি বা প্রায় সমার্থক হলেও, বিভিন্ন দেশে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এঁদের পরিচিতিকরণের মধ্যে কিছু তফাত হয়েছে। আর ভারতসহ আরও বেশ কিছু দেশ আছে যেখানে নাস্তিক, অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী ব্যক্তিদের এইভাবে চিহ্নিতই করা হয় না। তাঁরা ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস না করলেও, কোনো বিশেষ ধর্মের ছাপ তাঁদের ওপর সরকারিভাবে মেরে দেওয়া হয় অর্থাৎ বিশ্বাস কবা বা না করার গণতান্ত্রিক অধিকার এ-সব দেশে অস্বীকৃত। কেরলে তো আইন করেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস না করলেও কারোর বাবা-মা হিন্দু হলেই তাকেও হিন্দু হতে হবে। এখানে কয়েকটি দেশের নাস্তিক/অধার্মিকের শতকরা হিসাব দেওয়া হলো :

দেশ	নাস্তিক	অধার্মিক বা ধর্মহীন
অস্ট্রিয়া	উভয়ে মিলে	৬.০ (১৯৮১ সালের হিসাব)
অস্ট্রেলিয়া	—	১২.৭ ('৮৬)
আলবেনিয়া	১৮.৭	৫৫ ৪ ('৮০
ব্রাজিল	০.৪	১.০ ('৮০)
বুলগেরিয়া	৬৪.৫	— ('৮২)
কানাডা	—	৭ ৪ ('৮১)
চীন	১২	৫৯.৩ ('৮০)
কিউবা	৬.৪	৪৮.৭ ('৮০)
চেকোস্লোভাকিয়া	২০.১	— ('৮০)

দেশ	নাস্তিক	অধার্মিক বা ধর্মহীন
ফ্রান্স	৩.৪	(এঁদের সংখ্যা আরও বেশী হলেও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি) ('৮০)
ফরাসী গয়ানা (দক্ষিণ আমেরিকা)	—	২.৫ ('৮০)
ফরাসী পলিনেসিয়া (প্রশান্ত মহাসাগর)	—	৫.০ ('৮০)
পূর্ব জার্মানি (GDR)	—	প্রায় ৪৬.৬ ('৯০)
পশ্চিম জার্মানি (FRG)	০.১	৩ ৬ ('৯০)
গয়ানা	—	৩.৭ ('৮০)
হাইতি	—	১.২ ('৮০)
হাঙ্গেরি	উভয়ে মিলে	১২.১ ('৮৬)
আইসল্যান্ড	—	১.৩ ('৮৯)
ইতালি	২.৬	১৩.৬ ('৮০)
জামাইকা	উভয়ে মিলে	১৭.৭ ('৮২)
		(এ ছাড়া ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই উল্লেখ করেননি শতকরা ১১.২ জন)
উত্তর কোরিয়া	উভয়ে মিলে	৬৭.৯ ('৮০)
লাওস	১.০	৩.৮ ('৮০)
ম্যাকাউ	—	৪৫.৮ ('৮১)
মার্টিনিক	—	১২-এর কিছু কম ('৮৭)
মঙ্গোলিয়া	উভয়ে মিলে	৬৫.৪ ('৯০)
নেদারল্যান্ডস	—	৩২.৬ ('৮৬)
নেদারল্যান্ড অ্যান্টিলিস	—	২.৬ ('৮১)
নিউজিল্যান্ড	—	১৬.৪ ('৮৬)
নরওয়ে	—	৩.২ ('৮০)
পর্তুগাল	—	৩ ৮ ('৮১)
রিইউনিয়ন (ভারত মহাসাগর)	প্রায় ২.০	— ('৮৬)

দেশ	নাস্তিক	অধার্মিক বা ধর্মহীন
রুমানিয়া	৭.০	৯.০ ('৮০)
সানমোরিনো	—	৩.০ ('৮০)
সিঙ্গাপুর	—	১৭.৬ ('৮৮)
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	—	প্রায় ২ ('৮৬)
স্পেন	উভয়ে মিলে	২৬ ('৮০)
ত্রিনিদাদ-টবাগো	—	১.০ ('৮০)
সোভিয়েত রাশিয়া	২০.৫	২৯.৭ ('৮৯)
ইংল্যাণ্ড (UK)	—	৮.৮ ('৮০)
আমেরিকা	০.২	৬.৬ ('৮০)
উরুগুয়ে	উভয়ে মিলে	প্রায় ৩৫.১ ('৮০)
ভ্যানুয়াটু	—	(অজ্ঞাত ৯ ৮) ১.১ ('৭৯)
ভিয়েতনাম	উভয়ে মিলে	প্রায় ১৮.৫ ('৮০)
ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ	—	১.২ ('৮০)
যুগোস্লাভিয়া	উভয়ে মিলে	প্রায় ১৬.০ ('৯০)

মানবিক মূল্যবোধ এবং প্রাসঙ্গিক সামাজিক শৃঙ্খলা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্যবাদ একটি চিন্তাপদ্ধতি—ধর্মের মতো বিস্তৃত সামগ্রিক একটি ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে বর্তমানে কমপক্ষে ১১০ কোটি মানুষ নাস্তিক বা ধর্মহীন। এঁদের কেউ কেউ একই সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত। এঁরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বা অমানুষ হিসেবে পরিচিত নন। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের ভালোর জন্য কাজ করা, এবং সততা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, নিজের ও অন্যের প্রতি সম্মানবোধ—ইত্যাদির মতো মানবিক চেতনাকে স্বাভাবিকভাবে অনুসরণীয় বলে মনে করেন—কোনো ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে নয়। ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প হয়ে উঠেছে আধুনিক নানা রাষ্ট্রের সংবিধান। তবু এখনো অব্দি, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও অনেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন ধর্মের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাই করা হয় (যেমন আমাদের দেশে); আবার অনেক রাষ্ট্রে ধর্মকে ব্যক্তিগত আচরণ পছন্দ-অপছন্দ হিসেবে

গণ্য করে, সরকারিভাবে কোনো ধর্মকেই পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় না, কিন্তু বাধাও দেওয়া হয় না (যেমন চীনে)। নাস্তিক-ধর্মহীন ব্যক্তির পাশাপাশি ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্যই এসবের মূলে।

নাস্তিকতা মানবসভ্যতার অতিঅগ্রসর পূর্ণতাপ্রাপ্ত (mature) অবস্থার চিন্তা ও এই অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষরা যে আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি কল্পনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল, পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে তা বিকশিত হয়েছে এবং মানুষের মানসিক-জাগতিক প্রয়োজনও কিছুটা মিটিয়েছে। এক সময় মানুষের জ্ঞান ও যুক্তিবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র হাজার আড়াই বছর আগে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা মানুষের মনে আসে (অবশ্য এর আগেও এ-চিন্তা বিচ্ছিন্নভাবেআসা অস্বাভাবিক নয়)। আর প্রাচীনতর ধর্মের ধারাবাহিকতায় আধুনিক পৃথিবীর মুখ্য সব ধর্মও সৃষ্টি হয়েছে মোটামুটি এই সময়কালেই। এ-সব ধর্ম যতদিন শাসকগোষ্ঠী ও বৃহত্তর জনসাধারণের প্রয়োজন মিটিয়েছে ততদিন তা বিকশিত হয়েছে। এ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বা কমে গেলে, হয় তার অবলুপ্তি ঘটেছে বা প্রসার কমেছে, কিংবা পরিমার্জিত হয়ে অন্যরূপ ধারণ করেছে। মানুষেরই সত্য উপলব্ধির প্রক্রিয়ায় নাস্তিকতারও সৃষ্টি। মানুষেরই প্রয়োজনে মানুষ দেখেছে, মানব সভ্যতার সুস্থ বিকাশের ও স্থায়িত্বের জন্য, এমন এক সমাজ প্রয়োজন যে সমাজে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার থাকবে না, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা হবে ন্যূনতম। এমন সমাজে ঈশ্বর জাতীয় কাল্পনিক ভরসাস্থলের উপর আত্মসমর্পণের প্রয়োজন মানুষের থাকবে না, প্রয়োজন হবে না ঐ ধরনের ধর্মেরও।

সুতরাং ঈশ্বর ও ধর্মের বিকল্প ঐ সামাজিক অবস্থার উপযোগী জ্ঞান, মূল্যবোধ, নিয়ম কানুন ইত্যাদি। নাস্তিকতা এরই একটি অংশ মাত্র বা এই আদর্শ, মানবিক অবস্থার উপযোগী চিন্তামাত্র। ঐ উন্নততর স্তরে পৌঁছনোর জন্য যে প্রচেষ্টা তার দার্শনিক ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নাস্তিক্যবাদ ও প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্তি—কারণ ঈশ্বর নির্ভরতা ও ধর্মবিশ্বাস (যা কমবেশি অন্ধ হতে বাধ্য) মানুষকে স্বাধীনভাবে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা দেয়ই। ঈশ্বরের জন্য নয়, —মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তবে তা ঈশ্বর ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মকে

অস্বীকার করতে বাধ্য। সম্প্রতি এ-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এর একটি যেমন মার্কসবাদ বা কমিউনিজম ; সব মার্কসবাদী বা কমিউনিস্টরাই নাস্তিক ও ধর্মহীন (যদি সত্যিই তিনি মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট হন)। কিন্তু সব নাস্তিক ও ধর্মহীন ব্যক্তিই মার্কসবাদী নন এবং তাঁরা বিভিন্নভাবে বিভক্ত। নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার জন্য এই বিভাজন নয় - এই বিভাজন নিজেদের শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিভিন্নতার জন্য।

তবে নাস্তিক্যবাদী চিন্তার যাথার্থ্য নির্ভর করে তার মানবিক দিকের উপর। নিছক পুরনো মূল্যবোধকে ভাঙ্গার জন্য যদি তা করা হয় এবং পাশাপাশি যদি উন্নততর মানবিক মূল্যবোধকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে ঐ নাস্তিকতা জনবিরোধী, সংকীর্ণ ও উদ্দেশ্যহীন হতে বাধ্য। যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক মন ব্যতিরেকে, নিছক আধুনিক সাজার চেষ্টায় যদি ঈশ্বর ও ধর্মকে অস্বীকার করা হয় এবং পাশাপাশি যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই উপযোগী চিন্তার প্রতিফলন না ঘটানো হয়— অন্তত তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো না হয়—তবে তা কপটতা মাত্র। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে পর্যায়ক্রমে ধর্মের বিকাশের স্বরূপকে উপেক্ষা করা মানুষকে ও মানুষের ইতিহাসকে অস্বীকার-অপমান করারই সামিল।

নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতাই মানুষকে একটি কাল্পনিক বিভেদ থেকে মুক্ত করে সর্বজনীন ঐক্যের পথ দেখায়, এবং মানুষ তখন অনৈক্যের যে কারণ —অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত বৈষম্য, সে-সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে, তার সমাধানেরও প্রকৃত চেষ্টা করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে কেউ বলে সর্বধর্ম সমন্বয় বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা ; ধর্মের প্রকৃত সত্য জানা (ঈশ্বরকে অস্বীকার না করেই), প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত খ্রীস্টান হওয়ার কথা, ইত্যাদি এবং তা হলেই নাকি মানুষে মানুষে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কথাগুলি হয় সরলবিশ্বাসীদের আকাশকুসুম কল্পনা বা সোনার পাথরবাটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, কিংবা সচেতন ধূর্তদের আরেকটি কৌশল—মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণিত অক্ষমতা ঢাকতে এবং ঈশ্বরে ও প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস নাস্তিক্যবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তার জন্য এই কৌশল তারা নিতে বাধ্য হচ্ছে।

নাস্তিক্যবাদী দর্শনই মানুষকে তার বাস্তব সমস্যা চিনতে ও তার সমা-

ধানের প্রকৃত পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস টিকিয়ে রেখে এই পথ খোঁজার চেষ্টা একসময় কানাগলির সম্মুখীন হতে বাধ্য।

ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে ও প্রাসঙ্গিক ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত আকাশ আত্মবিশ্বাস, মানবিক ঐক্য, সত্য ও মনুষ্যত্বের আলোয় উদ্ভাসিত। মানুষই এ-আলো জ্বালিয়েছে, মানুষেরই জন্য। এ-আলোর অনিবার্য সম্যক স্ফুরণ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বিজ্ঞানমনস্ক মানবপ্রেমিকের দল কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মিথ্যা বিশ্বাস ও যুক্তিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে, অন্যদের সাথী করে এ-আলোর মশাল হাতে সামনে এগিয়ে যাবেন।